কাজী আনোয়ার হোসেন

দুর্গমগিরি

মাসুদ রানা

সেবা প্রকাশনা

মাসুদ রানা

দুর্গমগিরি

কাজী আনোয়ার হোসেন

নিজভূমে পরবাসী থাকতে আর রাজি নয় ফিলিস্তিনীরা। ন্যায্য অধিকার চায় তারা, স্বাধীনতা চায়। প্রস্তুতি নিল তারা সময় বুঝে। তাদের অস্ত্রবাহী বাংলাদেশী জাহাজ ছিনতাই করল এক বিশেষ ইসরাইলী কমান্ডো বাহিনী—যেনেক। দেশের মুখরক্ষার স্বার্থে ছুটে গেল মাসুদ রানা লে. আতাসী ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে। ওমান উপসাগরে ভয়াবহ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। শেষ মুহূর্তে মঞ্চে উদয় হলো ইরগুন লিউমি, তার ভারি বোফোর্স কামান দেখে জান উড়ে গেল ওদের সবার। একটু এদিক-ওদিক হলেই সব শেষ। এখন উপায়?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২৮৩

দুর্গমগিরি

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)
facebook.com/groups/we.are.bookworms

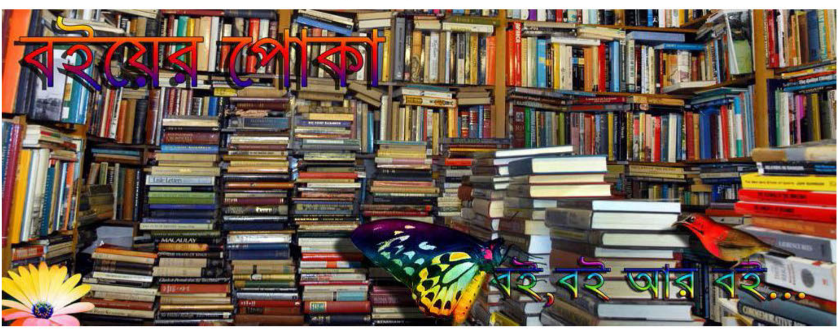

মাসুদ রানা ২৮৩

দুর্গম গিরি

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7283-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: টিপু কিবরিয়া

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-283
DURGOM GIRI
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তেত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক* মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ!*বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী * আমিই রানা *সেই উ সেন হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন* বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা* প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড় মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল* বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ *মহাপ্রলয় *যুদ্ধবাজ* প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি।

এক

পোর্ট সাইডে সালতানাত অভ ওমানের শুষ্ক উপকূল রেখে এগিয়ে চলেছে পনেরো হাজার টনী ফ্রেইটার 'বাংলার গৌরব'। অবশ্য অনেক দূরে রয়েছে তট, বিনকিউলারেও ভালমত দেখা যায় না।

গালফ অভ এডেন হয়ে রেড সী যাচ্ছে বাংলার গৌরব, গন্তব্য জর্ডনের আকাবা বন্দর। সামনে গালফ অভ ওমানের অ্যাপ্রোচ, এখনও দেখা দেয়নি। দেবে কিছুক্ষণের মধ্যে। চারদিকে এখন কেবলই দুস্তর পারাবার।

আগুনের গোলার মত তপ্ত সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে। অ্যাপ্রোচের এবড়োখেবড়ো, উঁচু ক্লিফের ওপর ঝুলছে এ মুহূর্তে। উপসাগরের নীল পানি বিক্ষুব্ধ, সূর্যের লাল রঙ গায়ে মেখে নীলকান্ত মণির মত ঝিকমিক করছে। পানিতে দৃষ্টি পড়লে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। গুমোট পরিবেশ। পাথুরে উপকূলের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে তপ্ত বাতাস।

সুতোর মত কালো উপকূল রেখা দেখা দিতে খোলা ডেকে এসে দাঁড়াল ফখরুল হাসান। চোখ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টে।

কেউ বলে আফ্রিকা, কেউ মধ্য প্রাচ্য, কিন্তু ফার্স্ট অফিসার ফখরুলের কাছে ওটা চিরকালই আরব। পবিত্র ভূমি। ধু-ধু মরু,

উট, বেদুঈন আর রক্ত, একটার সাথে অন্যটা জড়িয়ে আছে ওখানে। আর আছে ঘৃণা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, নির্যাতন আর ...আর, মাথা ঝাঁকাল সে ভাবনা থামিয়ে, 'বঞ্চনার ইতিহাস,' বিড় বিড় করে বলল।

হ্যাঁ, জঘন্য, নির্লজ্জ বঞ্চনার ইতিহাস। বঞ্চিত, ভিটেমাটি হারা আরবদের চোখের পানির উপাখ্যান।

গরমে গায়ের ভেতর চিড়বিড় করে উঠল। সামনে তাকিয়ে একটা ফিশিং ডাউ দেখতে পেল ফখরুল, এক ঝাঁক সী গাল পিছু লেগে আছে ওটার। দৈত্যাকার বাংলার গৌরবের দিকে বিশেষ খেয়াল নেই ডাউ চালকের, সামনে দিয়ে আড়াআড়ি ওমান উপসাগরের দিকে যাচ্ছে।

নিস্তব্ধতা চিরে খান্ খান্ করে দিল ফ্রেইটারের ফগহর্ন, বিকট 'ভঁ-আঁ-ক্!' শব্দে চমকে উঠল অন্যমনস্ক ফখরুল। বিক্ষুব্ধ সাগরের বুক ছুঁয়ে তীরের দিকে ধেয়ে গেল আওয়াজটা, ক্লিফে ধাক্কা খেয়ে বহু টুকরো হয়ে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। ডাউ চালক ঘুরে তাকাল। পাত্তা দিল না, যেমন চলছিল চলতে থাকল।

অনেক কাছ দিয়ে ফ্রেইটারের পাহাড় সমান উঁচু বো পেরিয়ে উপসাগরের অ্যাপ্রোচের দিকে ছুটে গেল ওটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নাচতে নাচতে। খোলা সাগর থেকে মাছ ধরে ফিরছে। ওটার সাথে লেগে থাকা সী গালগুলো পিছনের আলোড়িত পানিতে ঝপাঝপ্ ডাইভ দিচ্ছে, প্রপেলারের সৃষ্ট ঢেউয়ের সাথে খেলায় মত্ত ছোট ছোট মাছ ঠোঁটে বাধিয়ে উঠে পড়ছে সাথে সাথে।

ক্লিফের ওপাশে ঢলে পড়েছে সূর্য, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ঘনিয়ে আসছে আঁধার। সিগারেট ধরিয়ে রেলিঙে দুই কনুইয়ের ভর রেখে দাঁড়াল ফখরুল হাসান। সামনের কথা ভাবছে। গালফ অভ এডেন যত এগিয়ে আসছে, ততই চিন্তা বাড়ছে। নিরাপদে

আকাবায় না পৌঁছানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

টানা চলে ওখানেই প্রথমে নোঙর করার কথা ছিল তাদের, কিন্তু সে প্ল্যান বাধ্য হয়ে বাতিল করতে হয়েছে। আগামী বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে খেলতে রিয়াদ যাবে বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দল। এই জাহাজেই আছে তারা। ওমানের আউটার অ্যাঙ্কোরেজে নামিয়ে দিয়ে যেতে হবে তাদের, মাসকাট থেকে প্লেনে রিয়াদ যাবে। এদের জন্যে বড়রকম হেরফের ঘটে গেছে প্ল্যানে।

রাউন্ড শুরু হওয়ার আগে কয়েকটা ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলতে আর্জেন্টিনা গিয়ে ফেঁসে গেছিল দলটা। দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সব দেশে বর্তমানে চরম অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, পরিস্থিতির ওপর কোন সরকারেরই নিয়ন্ত্রণ নেই। ধর্মঘটে ধর্মঘটে প্রায় অচল ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা। প্রথম দেশ দুটোর বিমান সংস্থার ধর্মঘট এরমধ্যে দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে, ভাঙার কোন লক্ষণ নেই। বাকি ছিল আর্জেন্টাইন জাতীয় বিমান সংস্থা, বাংলাদেশ দল বুয়েনস আইরেস পৌঁছার একদিন পর তারাও অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট ডেকে বসল। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে ঠিক নেই। অথচ দলের বসে থাকার উপায় নেই, সময়মত অবশ্যই পৌঁছতে হবে। সড়ক পথে আর কোন দেশে গিয়ে যে প্লেনে উঠবে, সে পথও বন্ধ।

মাথা খারাপ হওয়ার দশা হয়েছিল ফুটবল ফেডারেশন কর্তাদের। দূতাবাসে ছোটাছুটি করতে করতে হয়রান। তিনদিন পর ঢাকা থেকে খবর এল, আর্জেন্টিনারই সান্তা ক্রুজ থেকে দেশী এক মালবাহী জাহাজ মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে ছাড়বে দু'দিন পর, ওটায় উঠে পড়ো। ওয়ার্ম আপ ম্যাচ বাতিল। পরে দুঃখিত হওয়ার চাইতে সময় থাকতে তৎপর হও।

ওইদিনই সন্ধের পর এটায় চড়েছে দল। ওদের জন্যে প্রায় দু'সপ্তাহ দ্বিগুণ গতিতে ছুটাতে হয়েছে জাহাজ। তবু ভাল যে শেষ রক্ষা করা গেছে। তিনদিন পর বাংলাদেশের প্রথম খেলা। ঘড়ি দেখল ফখরুল হাসান। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ওমানের মিনা কাবূজ বন্দরের আউটার অ্যাঙ্কোরেজে নোঙর ফেলবে জাহাজ। সময় বাঁচানোর ব্যবস্থা করা আছে। ওমানী কর্তৃপক্ষের ছোট এক ইয়ট এসে খেলোয়াড়দের নিয়ে যাবে।

আবার সিগারেট ধরাল ফার্স্ট অফিসার। দীর্ঘদেহী সে, বয়স পঁয়ত্রিশ। আগে ছিল বাংলাদেশ নেভিতে। মাটির চাইতে সাগর বেশি ভাল লাগে তার, বেশি টানে। তাই নেভি থেকে রিটায়ার করার পর বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে যোগ দিয়েছে। স্ত্রী মিমি আপত্তি করেছিল, ফখরুল শোনেনি।

বাংলার গৌরব আকাবা পৌঁছলে ছুটিতে যাবে সে। দীর্ঘ দু'মাসের ছুটি। কারণ তাদের দ্বিতীয় সন্তান আসছে। মেয়ে আশা করছিল ওরা দু'জন, আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে দেখা গেছে মেয়েই আসছে। প্রথম সন্তান ছেলে। ছয় বছর বয়স। মেয়ে হবে খবর পাওয়ার পর থেকে মনে মনে অস্থির হয়ে আছে ফার্স্ট অফিসার। কবে দেশে পা রাখতে পারবে, উন্মুখ হয়ে দিন গুনছে। অনাগত মেয়ের জন্যে এটা-ওটা কিনে নিজের কেবিন প্রায় ভরে ফেলেছে। সুযোগ পেলেই নাড়াচাড়া করে ওসব, আর মনে মনে হাসে।

মেয়ের চেহারা তার মত হবে না মিমির মত, চোখ বুজে ভাবছিল সে, লাউডস্পীকারে নিজের নাম শুনে সচকিত হলো। ল্যান্ডিং পার্টি রেডি কি না, চেক করে দেখার অনুরোধ করছে তাকে গ্রীক ক্যাপ্টেন।

শেষ হয়ে আসা সিগারেট ফেলে সোজা হলো হাসান। চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তীরের দিকে তাকাল। উত্তাপের কাঁপা কাঁপা

অদৃশ্য ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অনেক দূরে মিনা কাবূজ দেখা যাচ্ছে। গুবরে পোকা সাইজের একটা ইয়ট ছুটে আসছে ওদিক থেকে।

ক্রুজ মেসের দিকে এগোল সে ব্যস্ত পায়ে। এখন খারাপই লাগছে দলটার জন্যে। দুটো সপ্তাহ গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টায় ভালই কাটল খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের সাথে। ওরা নেমে গেলে ঠাণ্ডা মেরে যাবে বাংলার গৌরব। নাবিকের জীবন বড় নিঃসঙ্গ জীবন, বন্দরের অফ-শোর লীভ ছাড়া প্রায় বৈচিত্র্যহীন। ফ্রেইটারের নাবিকদের তো আরও। তবু রক্ষা যে তিনদিন পর সেও ছুটিতে যাচ্ছে, নইলে খারাপ লাগত। এদের অভাব ভোগাত খুব।

সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতা, আন্তরিক বিদায় সম্ভাষণ ইত্যাদি সেরে খুদে তিন ডিঙি চড়ে ইয়টে গিয়ে উঠল দলের সদস্যরা। ছেড়ে গেল ওটা।

একটু পর আবার প্রাণ ফিরে পেল বাংলার গৌরব, পায়ের নিচে ডেকের কাঁপন দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। ফুটবল টীম নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে তখন ওমানী ইয়ট। বন্দরের সমস্ত আলো জ্বলে উঠেছে। অদৃশ্য ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ওগুলোকে আলাদা করে চেনা কঠিন, মনে হয় যেন একটাই আলো–ফিতের মত লম্বা।

বেশ আঁধার হয়ে এসেছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে ভেতরের অস্বস্তি বাড়ছে হাসানের। ভয় ভয় একটা অনুভূতি গ্রাস করতে চাইছে। ভয়টা ওর জাহাজের কার্গো নিয়ে। ম্যানিফেস্টোয় কৃষি যন্ত্রপাতি লেখা থাকলেও অন্য কিছু বয়ে নিয়ে চলেছে সে আসলে, এবং সে কথা জাহাজে একমাত্র হাসানই জানে। জানে বলেই ভয়। যদি কোন অঘটন ঘটে যায়, অকল্পনীয় সমস্যায় পড়ে যাবে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক প্রচার পাবে ব্যাপারটা।

ইয়ট অদৃশ্য হয়ে যেতে ঘুরে দাঁড়াল ফার্স্ট অফিসার, ফোর

কার্গো হোল্ডের পাশ দিয়ে স্টার্নের তিনতলা সুপারস্ট্রাকচারের দিকে এগোল। ওখানকার খাটো, প্রায় খাড়া ইনার স্টেয়ারওয়েল বেয়ে ব্রিজের নিচের লেভেলে পৌঁছল। অফিসারদের সী কেবিন এরিয়া এটা। নিজের বাঙ্কে শুয়ে আছে প্রকাণ্ডদেহী গ্রীক ক্যাপ্টেন, পাপাগাইকোস ইউমেন্ডিস। ব্যারেলের মত চওড়া তার বুক-পেট। ষাটের মত বয়স। দেহের গঠন, হাঁটাচলা সব দানবীয়। হাসিখুশি, প্রাণখোলা মানুষ। হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করছে, এক হাতে পানীয়ের গ্লাস। কেবিনের আলো নেভানো।

'আহ্, হাসান! গ্রীটিংস, মাই ফ্রেন্ড!' ব্যারেলের ভেতর থেকে গমগমে আওয়াজ বের হলো, ধস্তাধস্তি করে বিশাল বপু খাড়া করল ইউমেন্ডিস। ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে হাসির ভঙ্গি করল। 'কাম ইন, কাম ইন!'

দু'মাসের মত হলো এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। বাঙালী যে ক্যাপ্টেন ছিলেন, হঠাৎ করে ভীষণরকম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জাহাজ তখন ব্রাজিলের সাও পাওলোতে। কাজেই আর কাউকে নিয়োগ করা ছাড়া উপায় ছিল না তখন। অস্বাভাবিক কিছু নয় ব্যাপারটা, সাগরে এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। ঘটে। প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। পৃথিবীর যে কোনও ব্যস্ত পোর্টে এ ধরনের ছুটো চাকরির আশায় বসে থাকা বেকার তবে অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন থেকে খালাসী পর্যন্ত সব পাওয়া যায়।

'ইভনিং, ইউমেন্ডিস,' ভেতরে পা রাখল ফার্স্ট অফিসার। 'কেবিন অন্ধকার করে রেখেছ কেন? ঘুমাচ্ছিলে?'

'না, মাই ফ্রেন্ড। বুড়ির কথা ভাবছিলাম,' প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে লাগল সে। 'অনেকদিন দেখা নেই তো, ভাবছিলাম এই ট্রিপ শেষ হলে একবার দেশে যাব।' চাপদাড়ির নিচে চাপড়া গাল চুলকাল।

'অনেকদিন মানে?' কেবিনের একমাত্র চেয়ারটায় বসল সে। 'দু'মাস আগেই না শুনলাম দেশ থেকে ফিরেছ?'

কপট বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল গ্রীক। 'মাই গড, বলো কি! দু'মাস হয়ে গেছে এরমধ্যে?' গ্লাসের পানীয় এক ঢোক চালান করল পেটে।

হাসল হাসান। 'তুমি দেখছি এই বয়সেও কম বউ পাগল নও!'

'কারেক্ট, ম্যান, বয়স। বয়সটাই যত নষ্টের গোড়া। আমার এক-আধটা ছেলেমেয়ে যদি থাকত, তাহলে বুড়ির চিন্তা এত না করলেও চলত। কিন্তু নেই বলেই হয়েছে যত জ্বালা। ঘন ঘন দেশে যেতে হয়, বেচারীকে একটু সঙ্গ দিতে হয়।' আরেক ঢোক গিলল। 'তারপর, বলো, কি মনে করে? তোমাকে একটু যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে?'

'না, সেরকম কিছু না,' আমতা আমতা করল সে। 'ভাবছিলাম...এই অঞ্চলটা সুবিধের না। প্যাঁচে পড়ে উল্টো পথে আসতে হলো, নইলে...'

'হ্যাঁ, দুর্ভাগ্য। নইলে আটলান্টিক হয়ে এলে জায়গামত পৌঁছে যেতে পারতাম আমরা এতদিনে।' গ্লাস শেষ করে মাথার কাছের টেবিলে রেখে দিল ক্যাপ্টেন। 'কি আর করা! ঘুরপথে না এলে তো খেলতে পারত না তোমার দেশ। ওদের ধর্মঘট এখনও চলছে।'

'হ্যাঁ।'

'চিন্তার কিছু নেই। এখন আর আগের মত ভয় নেই, অনেক ভদ্র হয়ে গেছে এ অঞ্চলের নেটিভরা।'

'তবু সতর্ক থাকা প্রয়োজন আমাদের,' খুব সতর্কতার সাথে, যেন কথার কথা, এমনভাবে বলল ফার্স্ট অফিসার। নির্দেশ আছে।

'আজকের রাতটা আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। খাড়া থাকতে হবে।'

ইঙ্গিতটা ঠিকই বুঝল গ্রীক। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল, অ্যালকোহলের প্রভাবে পানি জমেছে চোখে, তার ভেতর দিয়ে পিট্ পিট্ করে অফিসারকে দেখল। 'আমাকে কখনও মাতাল হতে দেখেছ তুমি, হাসান?'

'না।'

'তাহলে নিশ্চিন্ত থাকো, মাই ফ্রেন্ড! ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'তোমার মত নিশ্চিত যদি হতে পারতাম!'

'ওয়েল, তোমার কথামত রেডিও সাইলেন্স বলবৎ করার অর্ডার আগেই দিয়েছি আমি। এখন...আরও কিছু যোগ করতে চাও ওর সাথে?'

ভয় ভয় অনুভূতিটা হঠাৎ করে ফিরে এল, অস্বস্তি লেগে উঠল ফখরুল হাসানের। এই প্রথম মনে হলো ক্যাপ্টেনের সী কেবিনটা খুব ছোট, অপ্রশস্ত। দম আটকে আসছে তার। এয়ার কন্ডিশনিঙের মৃদু গুঞ্জন অসহ্য লেগে উঠল।

ব্যাপার টের পেয়ে উঠল গ্রীক, আলো জ্বেলে দিল। 'ব্যাপার কি, হাসান? এত দ্বিধা করছ কেন? বলোই না কি বলবে!'

লোকটা পুরো সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠেছে দেখে স্বস্তি ফিরে এল তার ভেতরে। পকেট থেকে একটা নোট বই বের করে নির্দিষ্ট পাতায় চোখ বোলাল। 'আজ ডিনারের পর আমরা আমাদের রাডার রেঞ্জ অ্যালার্ম দু'হাজার মিটার স্কেলে ফিক্স করব। যাতে এই সীমার মধ্যে কোন বোট বা কপ্টার, বা আর যা-ই আসুক, সময় থাকতে জানতে পারি।'

'নো প্রবলেম,' মাথা ঝাঁকাল ইউমেন্ডিস। 'আর?'

'একই সময় থেকে রেডিও অফিসার জেনারেল ওয়ার্নিঙের জন্যে চ্যানেল বারো, এবং এয়ারক্র্যাফট অ্যাপ্রোচ ওয়ার্নিঙের জন্যে চ্যানেল একশো পাঁচে কান খাড়া রাখবে।'

'মনে করো সে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।'

কিছু সময় নীরব থাকল ফার্স্ট অফিসার। ভাবছে। যে কার্গো রয়েছে জাহাজে, তা লোড করার আগে লম্বা প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। এক্স নেভাল অফিসার বলে সব ঝক্কি তাকেই সামলাতে হয়েছে, পুরো একটা মাস সময়মত নাওয়া-খাওয়ার সুযোগ পায়নি সে।

ব্রিজের চারদিক এবং ব্রিজ ডেকিং মুড়ে দেয়ার কাজ করতে হয়েছে তাকে কেভলার কম্পোজিট আর্মার শীট দিয়ে। শ্রাপনেল প্রতিরোধক শীট ওটা। উইন্ডোয় ফিট্ করতে হয়েছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রোটেকশন। মিসাইল আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে স্প্লিন্টারে পরিণত হতে পারে বলে সমস্ত ফর্মাইকা পার্টিশন, টেবিল বদলে প্লাইউড দিয়ে করা হয়েছে নতুন করে। ডেকের সমস্ত ফায়ার লাইন মুড়ে দেয়া হয়েছে আর্মার প্লেট দিয়ে। তারপর ইলেকট্রনিক ডিকয় সিস্টেম, আরএএম রাডার-অ্যাবজর্বেন্সি প্যাড, আরও কত কি! যত বাধাই আসুক, বাংলার গৌরব যাতে সেসব অগ্রাহ্য করে জায়গামত পৌঁছতে পারে, তার জন্যেই এতসব।

'কাল ভোর থেকে প্রত্যেকটা ফায়ার-ফাইটিং টীমকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে স্ট্যান্ডবাই রাখতে হবে, আকাবা না পৌঁছা পর্যন্ত।'

হাসি ফুটল গ্রীকের প্রকাণ্ড মুখে। 'তুমি দেখছি ভাবনাচিন্তা কোনটাই বাকি রাখোনি, হে!'

সশব্দে নোট বই বন্ধ করল ফখরুল হাসান, হাসির ভঙ্গি করল। 'পথে বেরিয়ে যা কখনও ঘটবে না ভাবা হয়, দেখা যায় শেষ পর্যন্ত তাই ঘটে বসে আছে। তাই....' থেমে শ্রাগ করল। 'আমরা কোনরকম ঝুঁকি নেব না।'

'বুঝেছি। আমার মনে হয় এসব ক্ষেত্রে পাইরেট নয়, ইনশিওরেন্সওয়ালাদের বেশি ভয় করে জাহাজ কোম্পানিগুলো। প্রিমিয়াম চার্জ লো রাখার জন্যে কত যে ঝামেলা করতে হয়, বাপ্‌রে! তারপরও যদি একটু স্বস্তি পাওয়া যেত।' উরুতে চড়াৎ করে চাপড় মারল গ্রীক। 'চলো, ব্রিজে যাই। ইয়েস?'

অ্যাফট স্টেয়ারওয়েল বেয়ে ওপরে উঠে পড়ল দুজনে। সংক্ষিপ্ত প্যাসেজ ধরে হুইলহাউসে যাওয়ার পথে রেডিও রুমের খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল। ভেতরে উঁকি দিয়ে সেটের সামনে বসা অল্পবয়সী অফিসারকে দেখল ক্যাপ্টেন। 'হেই, জয়ন্ত, টোটাল রেডিও সাইলেন্স, রিমেমবার? নো মোর সিগন্যালস্‌ টু ইওর মিলিয়ন রিলেটিভস্‌, রাইট?' চওড়া করে হাসল।

ঘুরে তাকাল জয়ন্ত। 'রাইট, ক্যাপ্টেন,' বলল হাসি চেপে।

ফার্স্ট মেট রফিক আছে শুধু হুইলহাউসে। পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল সে। 'অল কারেক্ট, স্কিপার,' রিপোর্ট করল।

মাথা ঝাঁকাল গ্রীক্‌। ফার্স্ট অফিসারকে অনুসরণ করে স্টারবোর্ড ব্রিজ উইঙে এসে দাঁড়াল। কোস্টলাইনের ওপাশে পুরোপুরি ডুব মেরেছে সূর্য। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে গোধূলির আলো। হাল্‌কা কমলা রঙের আকাশের পটভূমিতে পরিষ্কার ফুটে আছে ওমানের জেবেল ক্লিফের আউটলাইন। অজস্র ক্লিফ। অগুনতি।

'আহ্‌!' লম্বা করে দম নিয়ে বুক ভরে গুমোট বাতাস টানল ক্যাপ্টেন। সামনের দিগন্তে তাকাল চোখ কুঁচকে। 'সাগর আর আকাশ!' বলল বিড়বিড় করে। 'আকাশ আর সাগর। গত ত্রিশ বছরের প্রায় রোজই এই দৃশ্য দেখে আসছি আমি, মাই ফ্রেন্ড। সেম ভিউ। অবশ্য সবসময় আবহাওয়া এত চমৎকার থাকে না।'

'দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে?' সিগারেটের প্যাকেট বের করল হাসান, ক্যাপ্টেনকে একটা দিয়ে নিজে ধরাল।

'হ্যাঁ, বন্ধু,' একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল সে। 'ঠিক ধরেছ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় আমার খুব ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু মারা গেছে এই সাগরে। দুজনেই বড় ভাল মানুষ ছিল। এদিকে এলেই ওদের কথা মনে পড়ে, খুব খারাপ লাগে।'

লোকটাকে সমবেদনা জানাবার জন্যে মুখ খুলেছিল ফখরুল, তখনই হুইলহাউস থেকে ফার্স্ট মেটের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল: 'স্মল ক্র্যাফট্, স্কিপার! সামনে দেখুন, দুটো স্মল ক্র্যাফট্, এদিকেই...!'

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে তাকাল হাসান। চিৎকারের মর্ম বোঝামাত্র এমন এক ঝাঁকি খেয়েছে, মনে হলো অদৃশ্য একটা উত্তপ্ত লোহার শিক বুঝি কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে কানের মধ্যে। ক্যাপ্টেনও ঘুরল, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকাল। ওদিকে বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে সামনের দিকে চেয়ে আছে রফিক, চোয়াল ঝুলে পড়েছে বিস্ময়ে। সচকিত হয়ে ফগহর্ন বাজাল সে, সন্ধের শান্ত, সমাহিত পরিবেশ শিউরে উঠল, কাঁপন ধরল গুমোট, প্রায় স্থির বাতাসে। রফিকের দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকাল ফার্স্ট অফিসার, অজানা আশঙ্কায় ধড়ফড় করছে বুকের মধ্যে।

ভয়তাড়িত চোখে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। দেখল একটুপর। খুব নিচু, প্রায় ফ্ল্যাট দুটো খুদে কাঠামো, নীলচে ফসফরেসেন্ট ঢেউয়ের সাথে লুকোচুরি খেলছে যেন। ওগুলোর শক্তিশালী আউটবোর্ড এঞ্জিনের হুঙ্কার স্পষ্ট শুনতে পেল সে।

মুহূর্তের জন্যে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। ইয়াল্লা! ভাবল ফার্স্ট অফিসার, ওগুলো কি! কারা ওরা?

রেলিঙে পেটের ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল, দেহের প্রায় অর্ধেক বাইরে ঝুলিয়ে আরও ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। মনে হলো রাবারের তৈরি হেভি-ডিউটি জেমিনি ইনফ্লেটেব্ল্ ওগুলো,

পাশাপাশি ছুটে আসছে বাংলার গৌরবের বো সোজা। লাফিয়ে ঢেউয়ের মাথায় উঠছে, পরক্ষণে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে দুই ঢেউয়ের মাঝে, মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয়েই ফের মাথা তুলছে। কোত্থেকে এল ওগুলো?

'নিশ্চই ওমানী প্যাট্রল হবে।' তার দ্বিতীয় চিন্তাটা ভাষায় প্রকাশ করল গ্রীক। 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

কিছু বলল না হাসান, ভেতরে ঝড় বইছে। দ্বিধা, আশঙ্কা আর আতঙ্কে নড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ওমানীরা প্যাট্রল দেয় বোটে, ওসবে চড়ে নয়, এবং এরকম আচমকা হাজির হয় না ওরা। রেডিওর সাহায্যে যোগাযোগ করে তবে চ্যালেঞ্জ করে। এটা ওমানীদের স্টাইল নয়, হতেই পারে না। তাহলে?

এখনও অন্তত সাতশো মিটার দূরে আছে ওগুলো। এই আলোয় ওদের যে সময় থাকতে দেখা গেছে, তাই অনেক ভাগ্যের কথা। আবার ধমকে উঠল ফগহর্ন, আওয়াজটা যেন প্রাণের সঞ্চার করল ক্যাপ্টেনের মধ্যে। লম্বা তিন পদক্ষেপে হুইলহাউসে পৌঁছে গেল সে।

'স্পীড কত?'

'সেভেন নট, স্কিপার,' উদ্বিগ্ন গলায় বলল ফার্স্ট মেট।

ঘোঁৎ জাতীয় আওয়াজ বের হলো লোকটার গলা দিয়ে। গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল, 'রিভার্স এঞ্জিন!'

অসহায় চোখে একপলক ফখরুল হাসানকে দেখল রফিক, হাত বাড়াল কন্ট্রোলের দিকে। ঘামছে। 'কি করছ তুমি!' বিস্ময় ফুটল ফার্স্ট অফিসারের কণ্ঠে। 'রিভার্স দিলে ওরা...ওরা...'

'তুমি চাও ওদের ওপর জাহাজ তুলে দিই আমি?' গম্ভীর হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের চেহারা। 'যদি ওরা ওমানী প্যাট্রল হয়, কি ঘটবে ভেবে দেখেছ?' রফিকের দিকে তাকাল। 'ডু ইট, ফর গডস সেক,

ম্যান!'

সতেরো হাজার হর্সপাওয়ারের বারমেস্টার অ্যান্ড ওয়েন ডিজেল এঞ্জিন চালিত ভ্যারিয়েবল-পিচ প্রপেলার হঠাৎ করে জবরদস্তী উল্টো ঘুরতে শুরু করায় ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল দানবীয় ফ্রেইটার। প্রতিটা রিভেট পর্যন্ত কাঁপছে। তারপরও স্থির হতে প্রচুর সময় নিল বাংলার গৌরব। ওদিকে দুশ্চিন্তার মেঘে ছেয়ে গেছে ফার্স্ট অফিসারের চেহারা।

'আমরা ওদের পাশ কাটিয়ে যেতে পারি,' ব্যস্ত গলায় বলল সে।

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল ক্যাপ্টেন। 'তাতে বিপদ হতে পারে, মাই ফ্রেন্ড! আমরা ওদের ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছি ভেবে...' থেমে গেল কথা শেষ না করে।

অস্থির পায়ে বেরিয়ে এল হাসান, আবার রেলিঙে ভর দিয়ে সামনে তাকাল। অসহায় লাগছে নিজেকে, দিশা করে উঠতে পারছে না কি করবে। মন বলছে জাহাজ থামিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি, ভুল করেছে ক্যাপ্টেন। কিন্তু কি করার আছে হাসানের? লোকটা ক্যাপ্টেন, জাহাজের সুপ্রীম কমান্ড, তার নির্দেশ না মেনে উপায় কি? ওরা যদি ওমানী হয়ে থাকে, তাহলে ঠিক কাজই করেছে মানুষটা। নইলে নিঃসন্দেহে ঝামেলা হত। আর যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে ভুল করেছে। শাঁখের করাতে পড়েছে জাহাজ। ওদের পরিচয় না জানা পর্যন্ত...

অনেক কাছে এসে পড়েছে দুই জেমিনি। এত কাছ থেকে ওদের পথরোধ করার সুযোগ ওরা কি করে পেল রাডারের চোখ এড়িয়ে, বুঝতে দেরি হলো না ফার্স্ট অফিসারের। ওগুলো বেলজিয়ামের তৈরি, খুবই সফিস্টিকেটেড ক্র্যাফট। ভেতরে বাতাস ভরে চালানো হয়। ইচ্ছে হলে বাতাস রিলিজ করে সাগরে

ভাসিয়েও রাখা যায় হাই-প্রেশার এয়ার-বট্লের সাহায্যে। স্পেশাল ফোর্সের জন্যে তৈরি, রাডারকে ফাঁকি দেয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

প্রয়োজনমত যখন খুশি সুইচ টিপলেই হুশ্‌শ্! করে ফুলেফেঁপে ওঠে, টার্গেট কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে।

হঠাৎ করে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল দুই জেমিনি, কোনাকুনি ছুটে গেল বাংলার গৌরবের ডানে ও বাঁয়ে। ওদের ভোঁতা বো ঢেউয়ের মাথায় ঘন ঘন চাঁটি মারছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে যাচ্ছিল হাসান ভয়ের কিছু নেই ভেবে, তখনই আবছা লাইনটার ওপর চোখ পড়ল। দুটো বিট্ মিস্ করল হৃৎপিণ্ড, পরমুহূর্তে ঘোড়ার মত লাফাতে শুরু করল।

দুই জেমিনির বো-র সাথে বাঁধা আছে লাইনটার দুই প্রান্ত, ওদের মাঝের ব্যবধান যত বাড়ছে, ওটাও ততই দীর্ঘ হচ্ছে। পানিতে সাপের মত কিলবিল করছে। রেলিঙে ঠুকে নিজের মাথা গুঁড়ো করে ফেলতে ইচ্ছে হলো হাসানের। ব্রিটিশদের স্পেশাল বোট সার্ভিসের স্ট্যান্ডার্ড মেথড ওটা, জানে সে। শুধু জানেই না, এ ট্রেনিং নেয়া আছে তার। আর যেই হোক, সে কি করে এই ফাঁদে পা দিল? তার তো সন্দেহ করা উচিত ছিল...গলার সমস্ত জোর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ওরা বোর্ডিং পার্টি, ইউমেন্ডিস! ফুল স্পীড দাও, ফুল স্পীড!'

চেহারা দেখে মনে হলো বুঝি প্যারালাইজড্ হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন। চোখ বিস্ফারিত, ঠোঁট কাঁপছে। চেষ্টা করেও নড়তে বা গলায় স্বর ফোটাতে পারছে না।

সময় নষ্ট না করে এক লাফে ভেতরে ঢুকে পড়ল হাসান, ঘেমে গোসল করে ওঠা ফার্স্ট মেটকে এক ধাক্কায় আরেক মাথায় পাঠিয়ে দিয়ে এঞ্জিনরুমকে 'ফুল অ্যাহেড' নির্দেশ দিল। প্রচণ্ড

উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ, সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। নিচ থেকে চাপা ক্রিং ক্রিং আওয়াজ ভেসে আসতে একটা ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো ক্যাপ্টেন, বিশাল বপু নিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে হাসানের দিকে ঘুরল। রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা।

'হাউ ডেয়ার ইউ...'

প্রচণ্ড এক ধমক মেরে তাকে থামিয়ে দিল সে, উত্তেজিত হয়ে কন্ট্রোল ছেড়ে দু'হাতে গায়ের জোরে এক ধাক্কা মেরে বসল। তাল সামলাতে না পেরে টলোমলো পায়ে হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা। হয়তো রেলিঙের ওপরই পড়ত গিয়ে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে দরজার ফ্রেম খাব্‌লে ধরে ঠেকাল নিজেকে, আগুন চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল।

পাত্তা দিল না ফার্স্ট অফিসার, অ্যাকশন স্টেশন ক্রুদের সতর্ক করার জন্যে অ্যালার্ম ক্ল্যাক্সন বাজিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে। এদিকে নড়তে শুরু করেছে দৈত্যাকার বাংলার গৌরব, ডেকপ্লেট কাঁপছে ডিজেল এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর ধক্-ধক্ আওয়াজের সাথে তাল রেখে। ক্রমে গতি বাড়তে শুরু করেছে।

কিন্তু তার মন বলছে দেরি হয়ে গেছে। হেরে গেছে ওরা। যদি ইউমেন্ডিস গতি না কমাত, বো-র আঘাতে হয় লাইনটা কেটে যেত, নয়তো বেশি মজবুত হলে ও দুটোকে সাথে বাধিয়ে নিয়ে চলতে থাকত ফ্রেইটার। লাইনের টানে দু'দিকের হালের ওপর এসে আছড়ে পড়ত দুই জেমিনি, ছাতু হয়ে যেত বোর্ডিং পার্টির প্রত্যেকে। কিন্তু এখনকার ধীরগতি ওদের আরও সুবিধে করে দিল। একেবারে অনায়াস স্বচ্ছন্দে টেনে নিয়ে এল গায়ের ওপর।

দৌড়ে বেরিয়ে এল হাসান, ব্রিজ উইঙে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে এদিকের ক্র্যাফটাকে দেখতে পেল সে। অ্যামিডশিপ

বরাবর হালের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কালো পোশাক আর মুখোশ পরা কয়েকটা কাঠামো নড়েচড়ে উঠল ওটায়। নিচের রেলিঙে মৃদু টং-টং শব্দ উঠল, গ্র্যাপলিং হুক ছুঁড়ে মারছে ওরা নিচ থেকে। লাইন ধরে ঝুলে ওপরে উঠে আসার আয়োজন সম্পন্ন করেছে বোর্ডিং পার্টি, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর… তারপর…

এর পরের সবকিছু ঘটল অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে। অ্যাকশন স্টেশনের হতভম্ব ক্রুরা ঠিকমত দাঁড়াতে পারার আগেই প্রথম কালো ছায়া রেলিং টপকে ঝুপ্ করে লাফিয়ে পড়ল ডেকে। ভেজা কাপড় বেয়ে টপ্ টপ্ করে পানি ঝরছে তার, হাতে শোভা পাচ্ছে এম-সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেল। আরও একজন উঠল…আরও একজন। প্রেতের মত উঠছে ওরা।

ফখরুল হাসানের সেদিকে খেয়াল নেই। ওপরের ডেকে বুলহর্ন নিয়ে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে, গলা ফাটিয়ে চ্যাচাচ্ছে, 'রিপেল বোর্ডারস্! রিপেল অল বোর্ডারস্ বাই অল মীনস্! রিপেল…রিপেল…রিপেল!'

এক সময় হুঁশ হলো। বুলহর্ন ফেলে ক্যাপ্টেনের কলার মুঠো করে ধরল সে শক্ত করে। 'তোমাকে আমি…তোমাকে আমি…'

ঝট্কা মেরে হাতটা সরিয়ে দিল গ্রীক। 'থামো! তুমি আমাদের সবাইকে মারতে চাও নাকি? আমার কি দোষ, আমি কি জেনে বুঝে করেছি?'

কেবিনের ড্রয়ারে পড়ে থাকা নিজের ব্রাউনিংটার কথা খেয়াল হতে আফসোস হলো ফার্স্ট অফিসারের। সব কিছু এত দ্রুত ঘটে গেল যে ওটার কথা মনে করার মত সুযোগও আসেনি, নইলে যতগুলোকে সম্ভব শেষ করে দেয়া যেত।

একসঙ্গে অনেক জোড়া পায়ের আওয়াজ কানে আসতে ঘুরে

তাকাল সে। হঠাৎ করে একদম শান্ত, স্থির হয়ে গেছে। মেইন ডেকের স্টেয়ারওয়েল বেয়ে উঠে এল তিন কমান্ডো, খোলা উইঙে ওদের দেখতে পেয়ে থেমে পড়ল। পাঁজর বরাবর অস্ত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকল ভদ্রলোকের মত। যেন দাঁড়িয়ে থাকবে বলেই এত ঝুঁকি নিয়ে জাহাজে চড়েছে, দুনিয়ায় আর কোন কাজ নেই।

পিছনে জোর এক চড়াৎ! শব্দে চমকে উঠে ঘুরে তাকাল ফার্স্ট অফিসার। হুইলহাউসে দাঁড়িয়ে আছে আরও দুই কমান্ডো। নিশ্চই আউটার ল্যাডার বেয়ে উঠেছে হারামজাদারা, তারপর হ্যাচওয়ে দিয়ে···রফিকের গালে চার আঙুলের লালচে দাগ বসে আছে দেখে ভাবনার রাশ টেনে ধরল সে, আওয়াজটা কিসের ছিল বুঝে নিল। মাথার ওপর দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে মেট, চড়ের চোটে পানি এসে গেছে চোখে। হয়তো নির্দেশ পালন করতে দেরি করে ফেলেছিল।

রাডার স্ক্রীনের আলোয় কমান্ডোদের পোশাক চক্ চক্ করছে দেখল সে। রাবার স্যুট। কোমরে চওড়া অ্যামিউনিশন বেল্ট বাঁধা। কাঁধের পেশী শক্ত, আড়ষ্ট হয়ে উঠল হাসানের। অজ্ঞাত পরিচয় এতজন অস্ত্রধারী দেখে ভয় তো পায়ইনি, উল্টে বরং রাগে অস্থির। কিছুটা নিজের ভুলের জন্যে, বোকামির জন্যে, কিছুটা বর্তমান অসহায় অবস্থার জন্যে। অদম্য একটা প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ভেতরে।

কি ঘটিয়ে বসত বলা যায় না, কিন্তু তার আগেই ঠেকাল ওকে পাপাগাইকোস ইউমেন্ডিস। মেরুদণ্ডের ওপর তার পিস্তলের চাপ খেয়ে ঘুরে তাকাল বিস্মিত, হতবাক্ ফার্স্ট অফিসার।

'নো, মাই ফ্রেন্ড!' হাসল লোকটা। 'যুদ্ধ শেষ। কেন অহেতুক আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ?'

একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করল ফখরুল হাসান।

'বিশ্বাসঘাতক!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল কোনমতে।

দুই

চোখে আলো পড়তে অস্বস্তিকর ঘুম ভাঙল ফখরুল হাসানের। মাথার অনেক ওপরের বড় একটা ফাঁক দিয়ে ভেতরে এসেছে দিনের প্রথম আলো। ওটা অ্যাঙ্কর চেইন রান-আউট অ্যাপারচার। বো-র কাছের চেইন লকারে আটকে রাখা হয়েছে ওকে। জাহাজ থেমে নেই। রাতে বেদখল হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে চলা। আট নয় ঘণ্টা হলো চলছে বাংলার গৌরব। কোনদিকে, কে জানে?

রেইডারদের পরিচয় জানা হয়নি, তবে যারাই হোক ওরা, সবাই কড়া ট্রেনিং পাওয়া, ভারি স্মার্ট, মনে মনে হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রফেশনাল, অহেতুক ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়নি ক্রুদের মধ্যে। করেনি। দরকারও ছিল না। কারণ পরিস্থিতি প্রথম থেকে সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

অবশ্য, তিক্ত মনে ভাবল হাসান, সে জন্যে বিশ্বাসঘাতক গ্রীকটাকেও ক্রেডিট কিছুটা দিতে হয়। তার সাহায্য না পেলে বাংলার গৌরব দখল করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না ওদের পক্ষে।

হারামজাদা পাপাগাইকোস ইউমেন্ডিস!

কিন্তু কি করে? এই একটা প্রশ্নের উত্তর আবার নতুন করে হাতড়ে বেড়াতে লাগল সে। কি করে জানল সে ওদের গোপন

কার্গোর কথা? কবে, কিভাবে যোগাযোগ করল সে রেইডারদের সাথে? কার মাধ্যমে? নাকি এটা স্রেফ একটা পাইরেসি? কার্গো কি, না জেনেই···থেমে মাথা দোলাল ফখরুল হাসান। হতে পারে না, অসম্ভব। জেনেশুনেই এসব ঘটানো হয়েছে। কিন্তু কি করে এত গোপন এক তথ্য ফাঁস হলো, মাথায় আসছে না।

ধীরে ধীরে আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে জাগল। ওরা যখন সাও পাওলোয় জাহাজের নিরাপদ চলা নিশ্চিত করতে ব্যস্ত, তখনই হয়তো ফাঁস হয়েছে খবরটা, সে যে করেই হোক। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল হাসান। ক্যাপ্টেনের হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়া স্যাবটাজ ছিল না তো? কোন অদৃশ্য মহল তাকে সরিয়ে ইউমেন্ডিসকে ক্যাপ্টেন হিসেবে বাংলার গৌরবে তুলে দেয়ার জন্যে কলকাঠি নেড়েছিল?

বাল্কহেডে হেলান দিয়ে স্তম্ভিতের মত বসে থাকল সে। সম্ভাবনাটা যত নাড়াচাড়া করছে, ততই অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে আসছে অবিশ্বাস্য, নগ্ন সত্যটা। একসময় আপনমনে মাথা দোলাল, এ না হয়েই পারে না। তাহলে···তাহলে এই রেইডার পার্টি, এরা কারা? ওমানী? না। সৌদি? না। ইরাকী, বা ইরানী? না। জর্ডানী? না।

কি কার্গো রয়েছে বাংলার গৌরবে, না জেনে এ কাজ করা হয়নি, বরং জেনেশুনেই করা হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে তাদের কারোরই বাগড়া দেয়ার কথা নয়। কোন স্বার্থ নেই তাদের এর পিছনে, থাকতে পারে না। তাহলে বাকি থাকে আর একটা মাত্র পক্ষ।

সে ইসরায়েল!

ইহুদীবাদী, জায়নবাদী ইসরায়েল। ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্লজ্জ সমর্থনপুষ্ট মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া। একমাত্র ইসরায়েলেরই

স্বার্থ আছে এর পিছনে। এই জন্যেই, আবার মাথা দোলাল হাসান, এই জন্যেই। ওরা জানত তার পরিচয়। হয়তো তাই প্রথম সুযোগেই সবার থেকে আলাদা করে ফেলেছে তাকে, ফ্রগমার্চ করিয়ে নিয়ে এসেছে ওকে এই চেইন লকার পর্যন্ত। পরনের কাপড়-চোপড় খুলে একটা বয়লার স্যুট পরতে বাধ্য করেছে, জুতো বদলে রাবার সোল ক্যাম্বিসের জুতো পরিয়েছে। তাও ফিতেহীন। তারপর প্লাস্টিককাফ স্ট্রিপ দিয়ে হাত-পা মজবুত করে বেঁধে ফেলে রেখে গেছে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফখরুল হাসান, কোনমতে যদি একবার বের হতে পারত এখান থেকে, তারপর··· কোনমতে যদি ক্রুজ মেসে পৌঁছে সদ্য সেট করা সার্চি এমার্জেন্সি রেডিও বীকনের সুইচ টিপে···। হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করে দেখেছে সে, খুব শক্ত। জোরাজুরি করলে কেটে বসে।

সচকিত হলো সে। বদলে গেছে এঞ্জিনের একঘেয়ে আওয়াজ, অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে ঘুরল বাংলার গৌরব। থেমে পড়ল। বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর নীরবতা। একটু একটু দুলছে জাহাজ, সুপারস্ট্রাকচারের এখানে-ওখানে মৃদু ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠছে। অনেক নিচে খোলের গায়ে অলস চাপড় মারছে পানি। এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

কোথায় জায়গাটা? কোথায়···? লকারের বাইরের ডেকপ্লেটে কয়েকজোড়া ভারী পায়ের আওয়াজ উঠল। হ্যাচের ল্যাচ খোলা হলো, তারপর হ্যাচ। রোদ ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেতরে। চোখ সয়ে আসতে ঘুরে তাকাল ফখরুল। তিন কমান্ডো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন এসে বাঁধন কেটে দিল ওর।

'বেরিয়ে এসো,' বাইরে দাঁড়ানো এক কমান্ডো আরবীতে বলল। মৃদু, তবে কর্তৃত্বের সুর আছে বলার মধ্যে। তাকেই নেতা

মনে হলো।

পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে এগোল সে। বাইরে এরইমধ্যে সব ভাজা হতে শুরু করেছে রোদের তেজে। মনে মনে কমান্ডোর নির্দেশের টান সঠিক খাপে বসাবার চেষ্টা করল হাসান। ও হিব্রুভাষী, কোন সন্দেহ নেই। পা চালাবার বিশেষ গরজ দেখাল না সে, আড়চোখে লোকগুলোকে দেখে নিল। নেতা বাদে অন্যরা সশস্ত্র, তৈরি। উপায় নেই কিছু করার।

সূর্যের অ্যাঙ্গেল দেখে বিয়ারিং নেয়ার চেষ্টা করল। প্রায় আকাশ ছোঁয়া ধূসর রঙের এক পাথুরে ক্লিফের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাংলার গৌরব। এটা একটা ইনলেট। চারদিকেই ক্লিফ—অতন্দ্র প্রহরীর মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সগর্বে। বহু বহু শতাব্দীর প্রাচীন। সবগুলোর চুড়ো থেকে অদৃশ্য ধোঁয়া উড়ছে অসহ্য তাপে। নরওয়েজিয়ান ফিওর্ডগুলোর সাথে যথেষ্ট মিল আছে এখানকার।

দশটা বাংলার গৌরবকে লুকিয়ে রাখা যাবে, এত বড় ইন্‌লেট এটা। কাছের ক্লিফের সাথে বাঁধা আছে ফ্রেইটার। যেখানে ওটার লাইন বাঁধা, সেখানে এবং ডেকে কয়েকজন রেইডারকে দেখল হাসান, ক্যানভাসের ক্যামোফ্লেজ শীট দিয়ে ফ্রেইটার ঢেকে দেয়ার কাজে ব্যস্ত। অনেকটা কাজ এগিয়েও গেছে এরমধ্যে। ইনলেটে ঢোকার মুখের দিকে তাকাল সে, জেবেলের ভাঙা রিমের ওপর চোখ পড়ল। মাইলখানেক দূরে ইনলেটের মুখ আড়াল করে রেখেছে ওটা।

ছিনতাই হওয়ার পর থেকে চলার গতি, সময় এবং সূর্যের অ্যাঙ্গেল, ইত্যাদি মিলিয়ে জটিল অঙ্ক কষতে শুরু করল হাসান মনে মনে। সিদ্ধান্তে পৌঁছল, এ জায়গা নিশ্চই বিশাল, বিস্তীর্ণ মুসানডেম পেনিনসুলার দক্ষিণ প্রান্তের কোথাও হবে। হরমুজ

প্রণালীর সৃষ্টি এই পেনিনসুলা থেকেই। অবশ্য অনেক দূরে রয়েছে প্রণালী, একশো মাইলেরও বেশি বৈরী কোস্টলাইনের আরেক মাথায়। এরমধ্যে আছে অসংখ্য হাই-সাইডেড বে-র গোলকধাঁধা, ইনলেট। এক-আধটা জেলে পল্লী ছাড়া পুরো এলাকা বিরান।

এক অর্থে বাংলার গৌরবকে বিশ্বের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এরা। কেউ কিছু জানবে না, টের পাবে না। হাসানের জানা আছে, এক-আধটা মাছ ধরার আরবী ডাউ ছাড়া কোন নৌযান এ অঞ্চলের ধার ঘেঁষে না।

কমান্ডোদের দিকে নজর দিল। মোট আটজন ওরা নেতাসহ। নেতা লোকটা অন্যদের তুলনায় খাটো–পাঁচ ফুট ছয় হবে হয়তো। নীল চোখ। পাশে সবার চেয়ে চওড়া। ষাঁড়ের মত প্রশস্ত কাঁধ। অভিব্যক্তিহীন চেহারা। মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে ক্রুজ মেস দেখাল হাসান। 'আমি ওদের সাথে যোগ দিতে পারি?'

তার ইঙ্গিতে মেসের হ্যাচওয়ে খুলে দিল একজন। ভেতরে ধোঁয়া ছাড়া বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না ওর পয়লা দর্শনে। 'যান!' নির্দেশ দিল নেতা।

'এখানে কেন এসেছি আমরা জানতে পারি? কতদিন থাকতে হবে?'

নীল চোখে ধৈর্য হারানোর লক্ষণ ফুটল। 'ভেতরে যান!'

যেতে হলো না, অন্যজনের ধাক্কায় আপনিই মেসে সেঁধিয়ে গেল সে। মেসের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে জাহাজের অফিসার-ক্রু সবাই। সবাই দেখল তাকে, কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় এতই ডুবে আছে যে উঠে এসে কথা বলার গরজ দেখাল না একজনও। ফার্স্ট মেট রফিক শুধু হাসল একটু ভ্যাঙচানোর মত করে। সিগারেটের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে উঠল হাসানের।

'হেই, মাই ফ্রেন্ড!' ক্যাপ্টেনের গলা শুনে ঘুরে তাকাল। আগের মতই হাসি খুশি দেখাচ্ছে লোকটাকে, যেন সব স্বাভাবিক আছে। কিছুই ঘটেনি। 'এদিকে, আমার কাছে এসে বোসো।'

তার ধারেকাছে ঘেঁষার ইচ্ছে না থাকলেও এগোতে হলো হাসানকে। কারণ তার গোপন সার্চি রেডিও বীকনের বেঞ্চ লকারের ঠিক ওপরে বসে আছে ব্যাটা। চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে তার পাশে বসল হাসান। প্রায় সাথে সাথে ওর নাস্তা আর গরম কফি নিয়ে এল ফিলিপিনো কুক।

'আমি খুব দুঃখিত ওরা তোমাকে চেইন লকারে আটকে রেখেছে বলে,' বলল গ্রীক। যদিও চেহারা দেখে উল্টোটাই মনে হলো।

'ধন্যবাদ,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল ও। 'কিন্তু এসবের অর্থ কি বলো দেখি! এরা কারা, কোন্ দেশী?' কথার ফাঁকে হেলান দিয়ে বসল, একহাতে মুঠো করে ধরে রেখেছে গদিমোড়া বেঞ্চের সামনের কিনারা। একটু একটু করে ইউমেন্ডিসের দিকে এগোচ্ছে হাতটা, তার উরুর নিচে, কিনারার ভেতরদিকে সেট করা আছে বীকনের সুইচ।

'এরা? জর্ডানিয়ান কমান্ডো।'

লোকটার মুখের দিকে তাকাল ফার্স্ট অফিসার। 'কামন, ইউমেন্ডিস। ওরা যদি জর্ডানিয়ান হয়, আমি তাহলে সক্রেটিস।'

শ্রাগ করল সে। 'এ নিয়ে প্রশ্ন না করাই ভাল। ওদের কানে গেলে বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

'ওরা কার্গো হোল্ডে ঢুকেছে?'

'হয়তো, আমি দেখিনি।' সন্দেহের চোখে ওকে দেখল গ্রীক। 'ক্রেটে কি আছে আসলে বলো তো! কেন ওরা হাইজ্যাক করল শিপ?'

হাত থেকে কাপ ছুটে গেল হাসানের, বেশ খানিকটা গরম কফি লোকটার উরুতে পড়তেই ছিট্‌কে উঠে দাঁড়াল সে। চেহারা বিকৃত করে জোরে জোরে ডলতে লাগল জায়গাটা। 'সরি!' বলে ঝুঁকে নিজের ডান জুতোয় ঢুকে পড়া কফি ঝেড়ে ফেলল হাসান জুতো খুলে, অন্যহাত দেহের আড়ালে রেখে লকারে ভরে দিল, টান মেরে বের করে ফেলল বীকনের পিন।

সোজা হয়ে বসল তারপর। বুকের বিশ মনী পাথরটা নেমে গেছে। অনেক হালকা লাগছে এখন নিজেকে। সঙ্কেত জায়গামত পৌঁছলে হলো, তারপর দেখা যাবে এদের কত ক্ষমতা। নিজের জায়গায় বসতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় দড়াম করে খুলে গেল দরজা। এম-সিক্সটিন হাতে নেতাকে ওখানে দাঁড়ানো দেখা গেল।

'ইউ, হাসান,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কোথায় ওটা?'

'কি!' সোজা হলো ও।

ভেতরে এসে দাঁড়াল লোকটা, রাইফেলের নল ঠেসে ধরল ফার্স্ট মেট রফিকের কানের ওপর। 'তিন পর্যন্ত গুনব আমি, এরমধ্যে বলতে হবে কোথায় আছে তোমার ডিসট্রেস বীকন। ওয়ান...টু...'

'ওকে, ওকে!' নিচু হয়ে বীকনটা বের করল সে, ছুঁড়ে দিল মেস টেবিলের ও মাথার দিকে। ওটা মুঠোয় নিয়ে বেরিয়ে গেল কমান্ডো, দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে কেঁপে উঠল মেস।

ধীরে ধীরে বসে পড়ল ফখরুল হাসান। জানার উপায় নেই, পেনিনসুলার উত্তর প্রান্তে, বেশ একটু দূরে রয়েছে আরেক অজ্ঞাতপরিচয় জাহাজ, তার সঙ্কেত ইন্টারসেপ্ট করেছে ওটা। এদের খবরটা জানিয়ে দিয়েছে। বিশেষ এক সম্পর্ক আছে ওটার কমান্ডোদের সাথে।

তিন

তিনদিন পর। ঢাকা।

বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের মুখোমুখি বসা মেজর (অব.) মাসুদ রানা। স্বভাবসুলভ ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন বৃদ্ধ, আরেকদিকে তাকিয়ে ভাবছেন কি যেন। ঘন, কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে আছে। পাইপ কখন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে খেয়ালই নেই। টেনে চলেছেন ঘন ঘন।

বেশ কিছুক্ষণ থেকে ও তরফ থেকে আর কিছু আসছে না দেখে মুখ খুলল রানা। 'এ কবেকার কথা, স্যার?'

বাঘের চোখে তাকালেন বৃদ্ধ, যেন সব দোষ ওরই। 'তিনদিন আগের। জেরিকো তাই বলছে, ইয়াসির আরাফাতের সামরিক উপদেষ্টার মেসেজ পেয়েছি আমি, আজ খুব ভোরে।' জেরিকো সীমিত স্বায়ত্বশাসন পাওয়া ফিলিস্তিনের রাজধানী।

'হানান আবদুল্লাহ্?'

'হ্যাঁ। খোলা সাগর থেকে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে অতবড় জাহাজটা। কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কে জানে! সাগরে তো নিশ্চই, আকাশ পথেও তিনদিন ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ওটাকে আল-ফাতাহ্, পাত্তাই নেই। খবর শুনে আরাফাতের মাথা খারাপ হওয়ার দশা।'

পোড়া তামাক ফেলে নতুন করে ভরলেন তিনি। ধরিয়ে পরপর কয়েকটা টান দিলেন। 'ওগুলো ফিলিস্তিনীদের পেতেই হবে, রানা। নইলে আরাফাতের সমস্ত পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবে।'

'কাজটা ইসরাইলীদের সন্দেহ করছেন?'

পাল্টা প্রশ্নে ওকে বিপদে ফেলে দিলেন বৃদ্ধ। 'ঘটনা তো মোটামুটি শুনলে, তোমার কমন সেন্স কি বলে?' পরক্ষণে ওর ফেঁসে যাওয়া চেহারা দেখে মাথা ঝাঁকালেন। 'ওরাই। কোন সন্দেহ নেই।'

চুপ করে থাকল রানা। ভাবছে। বেগিন-আরাফাত শান্তি চুক্তির পর পশ্চিম তীরের জেরিকো, নাবলুস, হেবরন ও রামাল্লা এবং গাজার যে অংশ ফিলিস্তিনী স্বায়ত্বশাসনের অধীনে ছেড়ে দিয়েছে ইসরাইল, তাই নিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠন করতে তৈরি হচ্ছেন আরাফাত। ভেতরে ভেতরে জোর প্রস্তুতি চলছে।

তাঁকে গোপনে সমর্থন করছে কিছু আরব দেশ, অস্ত্র কেনার জন্যে প্রচুর টাকাও দিয়েছে। কারণ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হলে সবার আগে অস্ত্র চাই ওদের, নইলে ইসরাইলের আক্রমণে একদিনও টিকতে পারবে না ফিলিস্তিন। সে টাকায় অস্ত্র কিনেছেন আরাফাত। ওদের ব্যাপারে বাংলাদেশ সবসময়ই সহানুভূতিশীল, চিরকাল ওদের ন্যায্য অধিকারকে সমর্থন করে আসছে। এই প্রক্রিয়ায় ঢাকাও অংশ নিয়েছে। নগদ সাহায্য করার ক্ষমতা নেই, তাই বিনেভাড়ায় নিজের জাহাজ দিয়ে অস্ত্র বহনে সাহায্য করেছে আরাফাতকে।

কিন্তু যে করেই হোক, শেষ পর্যন্ত জানাজানি হয়ে গেছে ব্যাপারটা, কয়েক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রসহ উধাও হয়ে গেছে বাংলার গৌরব।

'এর পিছনে ওটার গ্রীক ক্যাপ্টেনের নিশ্চই কোন হাত আছে,' আবার বললেন রাহাত খান। 'সাও পাওলোয় অস্ত্র তোলার আগে বেশ কিছু কাজ করা হয়েছে জাহাজটার, নিরাপত্তামূলক আরকি! ওই সময় আমাদের দেশী ক্যাপ্টেন অসুস্থ হয়ে পড়ে হঠাৎ করে। অল্প-স্বল্প নয়, ভালরকম। তাকে রিপ্লেস করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু...'

নড়েচড়ে বসল ও। বুড়োকে আচমকা ব্রেক কষতে দেখে বাকিটা শোনার আগ্রহ বেড়ে গেল। 'কিন্তু কি, স্যার?'

'মাঝেমধ্যে জাহাজের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে। কেউ বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে রিপ্লেস করে অন্য কাউকে নেয়া হয়, সে যে কোন দেশের হতে পারে। অভিজ্ঞ হলেই হলো।' ডান চোখের পাশটা চুলকে নিলেন। 'তবে গুরুত্বপূর্ণ কেউ হলে তার ব্যাকগ্রাউন্ড ভালভাবে চেক করে নিতে হয়। শিপিং কর্পোরেশন এই গ্রীকের বেলায় তা ঠিকমত করেনি, করেছে দায়সারাভাবে। এ ব্যাপারে এতদিন কিছু জানায়নি ওরা আমাদের। এখন জানাচ্ছে চাপে পড়ে।'

'নতুন করে চেক করা হয়েছে এর ব্যাকগ্রাউন্ড?'

'হ্যাঁ। আমরা করেছি। রেকর্ড ভাল নয়।' অন্যমনস্কতার সুযোগে পাইপ আবার নিভে গেছে দেখে বিরক্ত হয়ে ওটা রেখে দিলেন তিনি। 'লোকটাকে জাহাজে তুলে দেয়ার জন্যে কোন বিশেষ মহল আমাদের ক্যাপ্টেনকে খাবারের সাথে স্লো পয়জন করে অসুস্থ করে তুলেছে।'

ঝুঁকে বসল ও। 'বিষ!'

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। বিরক্তিতে চেহারা কুঁচকে উঠল। 'সময়মত এসব জানা গেলে হয়তো কিছু করা যেত, কিন্তু...এতসব অপদার্থ অফিসার দিয়ে চালানো হয় বলেই

কর্পোরেশনগুলোর এই অবস্থা। এক বিচ্ছিরি কাণ্ড! আমরাই সেধে ওদের প্রস্তাব দিলাম সাহায্য করব বলে, অথচ কি হয়ে গেল দেখো।'

চুপ করে থাকল রানা। বৃদ্ধও ভাবনায় ডুবে গেলেন। নীরবতা ক্রমে জমাট বাঁধতে শুরু করল রুমে। এয়ার কন্ডিশনিঙের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সাউন্ড প্রূফ বলে বাইরের কোন আওয়াজ আসে না এ রুমে।

'তোমাকে যেতে হবে, রানা,' অকস্মাৎ বলে উঠলেন তিনি। 'যে ভাবে হোক জাহাজ-অস্ত্র উদ্ধার করে দেশের মুখরক্ষা করো।'

'জ্বি, স্যার।'

'কোত্থেকে কাজ শুরু করবে, তোমাকেই তা ঠিক করতে হবে। প্রথমে লন্ডন যেতে হবে। আরাফাতের সামরিক উপদেষ্টা ওখানে আছেন। দেখা করবে ওঁর সাথে। ভদ্রলোক হয়তো আরও কিছু লেটেস্ট তথ্য দিতে পারবেন। তবে যাই করবে, আনঅফিশিয়ালী করতে হবে। ফিলিস্তিনীদের অধিকার যত ন্যায়সঙ্গতই হোক, জানাজানি হয়ে গেলে কঠিন হয়ে উঠবে পরিস্থিতি। এই ছুতোয় ইসরায়েল হয়তো ওদের স্বায়ত্বশাসনও বাতিল করে দেবে। নতুন করে আগুন জ্বলে উঠবে মধ্যপ্রাচ্যে।' ইঙ্গিতে আলোচনার সমাপ্তি টানলেন বৃদ্ধ।

'সোহেলের সাথে দেখা করো। তোমার টিকেটিঙের ব্যবস্থা করে দেবে ও।'

'জ্বি।' উঠে পড়ল রানা।

তিনদিন আগের ঘটনা। জেরুজালেম।

গভীর রাত। গুরুত্বপূর্ণ সভা চলছে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে। প্রধানমন্ত্রী, তার দুই ইন্টেলিজেন্স অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার,

প্রতিরক্ষা বাহিনী যাহাল প্রধান এবং গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ প্রধান রয়েছে মীটিঙে।

কয়েকজনের চেহারা ফোলা। জরুরী ডাক পেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। তবে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন (বেঞ্জামিন) নেতানিয়াহু ও মোসাদ চীফ ইয়েহুদা বেন মেইর স্বাভাবিক। চেহারায় ঘুমের কোন চিহ্ন নেই। পূর্ণ সজাগ।

অপারেশন যেনেক (জাম্প) নিয়ে আলোচনা চলছে। যদিও বিশেষ কিছু নেই আজ আলোচনার। কথাবার্তা আগেই হয়ে গেছে। আজ বৈঠক বসেছে গোপন এক তৎপরতার বিরুদ্ধে সরকারের সময়োচিত সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপ ইত্যাদির পর যাহালের একদল কমান্ডোর মিশনের সাফল্য ও পরের করণীয় নিয়ে একমত হওয়ার জন্যে। অবশ্য সাফল্যের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি এখনও।

দামী দেয়াল ঘড়ি রাত দুটো ঘোষণা করতে নড়েচড়ে বসল যাহাল চীফ, মেজর জেনারেল ইয়াদ এলিয়াহুদ। মানুষটা খাটো, টাকমাথা। দেহ বুনো শুয়োরের মত, চর্বি থলথলে। ঘাড় প্রায় নেই। থুতনির নিচে তিনটে ভাঁজ। সামনে রাখা কালো এক ফোল্ডার কাছে টেনে আনল সে, সোনার ফ্রেমের আধখানা চাঁদের মত রীডিঙ গ্লাসের মধ্যে দিয়ে চোখ রেখে খুলল। হিব্রুতে টাইপ করা পুরু একটামাত্র শীট রয়েছে ভেতরে, তুলে নিল ওটা।

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আমি ঘোষণা করছি,' হাস্যকররকম চিকন, মিকিমাউসের মত গলায় চিঁ-চিঁ করে বলল সে। 'আমাদের কমান্ডো বাহিনীর মিশন, "অপারেশন যেনেক" শতকরা একশো ভাগ সফল হয়েছে।' অন্যদের চাপা সন্তুষ্টি আর বাহবার মধ্যে বলে চলল এলিয়াহুদ, 'অস্ত্রবাহী জাহাজ এখন নির্দিষ্ট গন্তব্যের পথে রয়েছে।

'বোর্ডিঙের সময় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, ওরা বাধা দেয়ার সুযোগ পায়নি। একটা বুলেট'ও খরচ হয়নি, প্রাণহানী দূরের কথা, কেউ সামান্যতম আহতও হয়নি। আশা করছি কাল দুপুরের আগেই ওটার জায়গামত অ্যাঙ্কর করার খবর পাওয়া যাবে। আমাদের মাদার শিপ যাচ্ছে ওদিকে। আশা করছি সপ্তাখানেক পর বাংলার গৌরবের কার্গো ওটায় রিলোড করা সম্ভব হবে।'

কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর মুখ খুলল মোসাদ চীফ। মন্তব্য করল, 'সময় আরেকটু এগিয়ে আনা গেলে ভাল হত।' মাথা দুলিয়ে তাকে সমর্থন জানাল প্রধানমন্ত্রী। 'এধরনের কাজ যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তত ভাল।'

'হ্যাঁ। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সভাসদরা নিশ্চয়ই জানেন যে একেবারে শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশী জাহাজটা তার রুট বদলেছে। সাউথ আটলান্টিক দিয়ে না এসে নর্থ প্যাসিফিক ঘুরে এসেছে। প্রথমে আমাদের প্ল্যান ছিল মোজাম্বিক চ্যানেলে ওটার পথরোধ করার, কিন্তু তা হয়নি। ওটা ঘুরপথে রওনা হতে নতুন হাইডিং প্লেস ঠিক করতে হয়েছে আমাদের হুড়োহুড়ি করে। আনুষঙ্গিক আরও হাজারটা ঝামেলা ছিল। তারওপর বাংলার গৌরব প্রায় ডবল স্পীডে ছুটেছে, কিন্তু আমাদের সে উপায় ছিল না। তেমন কিছু করতে গেলে আরাফাতের আরব বন্ধু দেশগুলোর সন্দেহ হত। তাই,' গাল চুলকাল এলিয়াহুদ।

প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করল। 'একটু পিছিয়ে পড়েছি আমরা। শিপ পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হয়েছে কমান্ডোদের। তবু, এত অসুবিধের মধ্যেও যে কাজটা ওরা শেষ পর্যন্ত করতে পেরেছে, তাই যথেষ্ট।'

'ঠিক।' সন্তুষ্ট দেখাল প্রধানমন্ত্রীকে। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। 'বেশ ভালই দেখিয়েছে ওরা। গুড!'

বুকের ছাতি ফুলে উঠল এলিয়াহুদের। 'যেনেকের কমান্ডার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কমান্ডো, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার। ওর জুড়ি নেই।'

'কি যেন নাম?'

'আপনার নেমসেক,' হাসল যাহাল চীফ। 'ইয়েহোনাথান (জোনাথন) নেতানিয়াহু। সার্ভিসে কর্নেল ইয়োন্নি নামে ডাকে সবাই।'

'ওদের সাফল্যের সম্মানে টোস্ট করার প্রস্তাব রাখছি আমি,' ইয়েহুদা বেন মেইর বলল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' সম্মতি দিল প্রধানমন্ত্রী।

একটু পর যে যার শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে ধরল, এলিয়াহুদের উদ্দেশে এক চোখ টিপে হাসল মোসাদ চীফ। 'লেচাইম (চিয়ার্স)!'

এক ঘণ্টা পর। বাংলার গৌরব।

আঁধার চিরে অজ্ঞাত গন্তব্যের উদ্দেশে ছুটে চলেছে ফ্রেইটার। ভোর হতে বেশি দেরি নেই। পোর্ট সাইড ব্রিজ উইঙে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে কমান্ডো নেতা কর্নেল নেতানিয়াহু ওরফে ইয়োন্নি। দু'পাশে দুই সঙ্গী। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছে ওরা নিশ্চিন্তে। শুনে ফেলার কেউ নেই কাছেপিঠে।

ফার্স্ট অফিসারকে আটকে রাখা হয়েছে চেইন লকারে, ক্যাপ্টেনসহ অন্যদের ক্রু'জ মেসে।

নিজের ছোট, তবে খুবই শক্তিশালী ট্রান্সিভারে একটা মেসেজ রিসিভ করল ইয়োন্নি। জেরুজালেম থেকে মাদার শিপ হয়ে এসেছে। আরেক নেতানিয়াহু পাঠিয়েছে ওটা, ইসরায়েলের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। সংক্ষিপ্ত মেসেজ: কল হাকাভদ (ওয়েল ডান)!

মৃদু হাসি ফুটল কমান্ডারের অভিব্যক্তিহীন মুখে। শুধু মুখেই,

চোখ পর্যন্ত পৌঁছল না হাসিটা। পৌঁছায় না কখনও।

মেশিনগানের টানা হুঙ্কারে পথ ভুলে গেছে যেন মরুর তপ্ত বাতাস, কোন্ পথে যাবে বুঝতে না পেরে স্থির হয়ে গেছে। সূর্য ওপর থেকে গনগনে আগুন ঢালছে।

মাথার বড়জোর দু'ইঞ্চি ওপর দিয়ে শিস কেটে ছুটে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, বাধ্য হয়ে বালিতে নাক ঢুকিয়ে কাঁটাতারের আঁকাবাঁকা প্রতিবন্ধক এড়িয়ে এগোতে হচ্ছে যুবককে। মাথা একচুল তোলার উপায় নেই। বালিতে মুখ ভরে গেছে, ঘামে জবজবে ড্রিল শার্ট দেখে বোঝা যায় না ওটা সত্যিই শার্ট, না চামড়া।

নোনতা ঘাম দৃষ্টিপথ আড়াল করে রেখেছে বলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না সে। প্রায় অন্ধের মত সামনে ছুটছে, বড়সড় গিরগিটি যেন একটা। গলা শুকিয়ে কাঠ, পানির জন্যে বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, অথচ সেদিকে খুব একটা খেয়াল নেই জামাল শামলুর। ট্রেনিঙ রানের প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে সে। আরেকটু গেলেই দৌড় শেষ।

কেবল দৌড় শেষ করলেই চলবে না, আজ ফার্স্ট হতে চায় সে। একজন সাচ্চা যোদ্ধা হতে চায়। দেখতে চায় আল-ফাতাহ্‌র কমান্ডিং অফিসারের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হওয়ার সময় যেন গর্ব আর সন্তুষ্টির ছোঁয়া ফোটে। একটা সুযোগ চায় জামাল একান্ত আপনজনদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার।

শাতিলা রিফিউজি ক্যাম্পে ইসরাইলী সৈন্যরা কুকুরের মত গুলি করে মেরেছিল ওর নিরীহ মা-বাবাকে, ভাইকে। আরও শ শ নিরপরাধ ফিলিস্তিনীকেও। ছোট ছিল জামাল, স্রেফ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। কিন্তু ছোট চোখে সেদিন যা দেখেছে ও, আজও সে

স্মৃতি জ্বল জ্বল করছে। রক্তের সাগর বইয়ে দিয়েছিল ওরা সাবরা-শাতিলা ক্যাম্পে। কুকুরকেও অত নির্দয়ভাবে মারে না বোধহয় মানুষ।

একেবারে আচমকা ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঢুকে নামাজে বসা, খেতে বসা, ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে নির্বিচারে গুলি করেছে সেদিন ইসরাইলী সৈন্যরা, নিশ্চিন্তে মায়ের বুকের দুধ খেতে থাকা শিশুকে মেরেছে, মাকেও মেরেছে। অসহায় ফিলিস্তিনীদের বুকফাটা কান্নায় সেদিন আল্লার আরশ কেঁপেছে কি না জামাল জানে না, তবে ওর ছোট্ট বুক কেঁপে গিয়েছিল ভীষণভাবে। মার রক্তাক্ত মৃতদেহ জড়িয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে পড়ে ছিল উপুড় হয়ে। চারদিকে এত চিৎকার, এত ছোটাছুটি, কান্না আর গুলির শব্দে পালাতে সাহস হয়নি। ভাগ্য ভাল, ওকে অনড় দেখে মরে গেছে ভেবে আর গুলি খরচ করেনি ইসরাইলীরা।

বেঁচে গেল জামাল শামলু। সে কবেকার কথা, অথচ আজও শান্তিতে ঘুমাতে পারে না ও। চমকে চমকে ওঠে ঘুমের মধ্যে, মার যন্ত্রণাকাতর মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে। বাবা, বড় ভাই জালালের চেহারা। জালাল রুটি খাচ্ছিল তখন। বুলডোজার এসে যখন লাশ গণকবরে নিয়ে যাচ্ছে, তখনও ওর দাঁতের ফাঁকে খানিকটা রুটি আটকে ছিল, দেখেছে জামাল। পরিষ্কার মনে আছে।

তারপর দিন যত গড়িয়েছে, ওর প্রতিজ্ঞাও তত মজবুত হয়েছে। প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে বুকে। রক্ত চাই জামাল শামলুর, অনেক রক্ত। ইহুদীর রক্তে গোসল না করা পর্যন্ত শান্তি নেই ওর। সে সুযোগ এসেছে আজ। আজই ওর ট্রেনিঙের শেষ দিন, ওকে আজ প্রমাণ করতে হবে···। আরও দ্রুত এগোতে চেষ্টা করল যুবক। বাড়তি চাপ পড়ায় নির্যাতিত প্রতিটা পেশী তীব্র

আর্তনাদ করে উঠল, খেয়ালই নেই সেদিকে।

হঠাৎ পাশেই আর কারও ঘন, ভারী নিঃশ্বাস পতনের শব্দ উঠতে ঘুরে তাকাল সে। দারভিশ হামামকে দেখতে পেয়ে রাগে, হতাশায় অস্থির হয়ে উঠল। সার্জেন্ট হামাম। বিশালদেহী এক দানব। বয়স ত্রিশের মত। চওড়া, নিরেট পাথরের মত মজবুত কাঁধ, চৌকো চোয়াল। প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় সংঘবদ্ধ পাতলা ঠোঁট। ওর মত নতুন রিক্রুটদের ঘষেমেজে তৈরি করছে সে।

দারভিশ হামাম স্পেশাল ফোর্সের সদস্য, জানে শামলু। ফিলিস্তিন কমব্যাট সুইমার ইউনিটের কমান্ডার। ট্রেইনীরা যেমন শ্রদ্ধা করে তাকে, তেমনি ভয়ও পায় বাঘের মত। ট্রেনিঙের সময় বাঘের মতই কড়া মানুষটা। কোনদিনও একে হারাতে পারেনি শামলু, ইউনিটের কেউ পারেনি। শেষ মুহূর্তে ঠিকই সবাইকে পিছনে ফেলে দেয়।

কিন্তু আজ...আরও দ্রুত এগোতে চেষ্টা করল যুবক। বুলেটের পরোয়া না করে বেশ খানিকটা উঁচু হলো সুবিধে হবে ভেবে। সেকেন্ডে সেকেন্ডে চুলে গরম নিঃশ্বাস ছেড়ে ছুটে যাচ্ছে ধাতব মৃত্যু, পরোয়া নেই।

'নিচু হও!' ধমকে উঠল সার্জেন্ট। 'নিচু হও, গাধা কোথাকার!'

হলো সে, তবে গতি প্রায় আগের মতই থাকল। শেষ পর্যন্ত দু'ইঞ্চির ব্যবধানে জিতেই গেল জামাল। ওর ব্যগ্রতা দেখে যে নিজের গতি ইচ্ছে করে কমিয়ে দিয়েছে সার্জেন্ট, বুঝতে পারেনি।

'অভিনন্দন!' নিজের পিঠে সার্জেন্টের শক্ত হাতের চাপড় খেয়ে কষ্ট ভুলে গেল জামাল। ঘাম মোছার ফাঁকে উদ্ভাসিত হাসিমুখে ঘুরে তাকাল। 'খুব ভাল করেছ তুমি, জামাল। চমৎকার! আমি খুব খুশি হয়েছি।'

বুকের মধ্যে আনন্দের বান ডাকল যুবকের, আবেগের বশে সার্জেন্টের হাতের উল্টোপিঠে চুমু খেল সে। 'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট।'

'আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই, সব কৃতিত্ব তোমার,' তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছল দারভিশ হামাম। 'কিন্তু শেষ সময় তুমি আজ যা করেছ, আর কখনও কোরো না। খবরদার! তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে, ভুলো না।'

চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠল জামাল শামলুর, চাউনি কঠোর হয়ে উঠল। প্রায় ফিস ফিস করে বলল সে, 'ভুলব না।'

যুবক স্বপ্নেও কল্পনা করেনি এর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা পর কামনা পূরণ হতে যাচ্ছে তার।

চার

পোর্টম্যান স্কয়ার। লন্ডন।

চার্চিল হোটেলের কার পার্কে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানার নীল সিয়েরা। ড্রাইভিঙ সীট থেকে নামল ও, পরনে ডার্ক গ্রে স্যুট, সাদা শার্ট, লাল টাই। পায়ে বিশ্বের সবচেয়ে দামী জুতো সীব্যাগোস। আয়নার মত ঝকঝক করছে চামড়া।

এঞ্জিন চালু, দরজা খোলা রেখেই প্রকাণ্ড প্রবেশপথের দিকে এগোল ও, এক পোর্টার বিনা বাক্য ব্যয়ে লটের দিকে চালিয়ে নিয়ে গেল গাড়িটা। পাঁচ মিনিট পর ষোলো তলার নির্দিষ্ট সুইটের

দরজায় নক্ করল রানা। ডেস্ক থেকে ওর আসার খবর জানানো ছিল, কাজেই মুহূর্তে খুলে গেল চকচকে পালিশ করা কাঠের দরজা।

ভেতরে কমপ্লিট স্যুট পরা এক সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে। ওকে নড করল সে। 'প্লীজ, ভেতরে আসুন।'

পা বাড়াল ও। যেমন বিশাল সুইট, তেমনি তার লাউঞ্জ। চোখ ধাঁধানো বিলাসের ছড়াছড়ি চারদিকে। ভেতরে তিন-চারজনকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা দেখা গেল। সবাই উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি এগিয়ে এলেন দ্রুত পায়ে। 'আহ্, সাবাহ্ আল খাইর, মিস্টার রানা?'

'সাবাহ্ ইন নূর, মিস্টার আবদুল্লাহ,' তাঁর বাড়ানো হাত ঝাঁকিয়ে দিল ও।

'আহলান ওয়া সাহলান। কাইফ হালাক?'

'ভাল আছি। ধন্যবাদ।'

'আসুন।' আর সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে, তাদের দিকে এগোল দুজনে। সবাই রানাকে দেখছে গভীর আশা নিয়ে। তিনজন।

ইয়াসির আরাফাতের আল ফাতাহ্র উঁচু পদের কর্মকর্তা এঁরা। প্রথমজন, হান্নান আবদুল্লাহ, প্রধান সামরিক উপদেষ্টা। একজন তাঁর সহকারী। অন্যদের একজন সংগঠনের ওমান, অন্যজন আমিরাত প্রতিনিধি। প্রথম যুবক আবদুল্লাহর একান্ত সচিব। আবদুল্লাহর সাথে রানার পরিচয় অনেকদিনের।

অন্যদের সাথে পরিচয় পর্ব সারা হতে বসল সবাই। সচিব কফি সার্ভ করল। আবদুল্লাহ প্রসঙ্গ তুললেন দুই চুমুক দিয়ে। 'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে, মিস্টার রানা। এত টাকার জিনিস, সব পানিতে গেল।'

'হতাশ হবেন না,' বলল ও। 'পুরোটা আগে শুনি। কাল লন্ডন

এসে আমি নিজেও কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছি। যা জেনেছি তাতে ভেতরের সব খবর বোঝা সম্ভব ছিল না। আপনি আমাকে একদম প্রথম থেকে খুলে বলুন দয়া করে।' খুক্ করে কাশল ও। 'তার আগে আরেকটা কথা। এখানে যা খুঁজে দেখতে বলেছিলাম, দেখেছেন?'

'শিওর,' দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন আবদুল্লাহ। 'দু'বার। শেষবার চেক করেছি মাত্র এক ঘণ্টা আগে। আমরা সবাই মিলে। নেই লিসনিং ডিভাইস। নিচের লাউঞ্জেও লোক আছে আমাদের। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই জানাবে।'

'বেশ, এবার বলুন। প্রথম থেকে।'

ঝুঁকে বসলেন ভদ্রলোক দুই হাঁটুতে কনুইয়ের ভর রেখে। 'আমরা যা করতে চেয়েছি, তার জন্যে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন অস্ত্রের। কিছু নিজেদের, কিছু বন্ধু আরব দেশের দেয়া সাহায্যের টাকায় তাই ওগুলো কেনার সিদ্ধান্ত নিই আমরা। যোদ্ধা তৈরির ট্রেনিং চলছে, অস্ত্র এলেই... সে যাক্। এ ব্যাপারে ভুলেও কখনও ইংল্যান্ড বা আমেরিকার কাছে যাই না আমরা, এবারও যাইনি।

'অনেক ভেবেচিন্তে ফ্রান্সের সাথে যোগাযোগ করলাম। অস্ত্র বিক্রির মাঠে লীডার হওয়ার জন্যে ইউরোপে একমাত্র ওরাই ক্রেতার পরিচয় নিয়ে মাথা কম ঘামায়। খোঁচাখুঁচি কম করে। তারপরও সরাসরি যাইনি আমরা, মিশর আমাদের হয়ে ওদের সাথে যোগাযোগ করে। আপনি বোধহয় জানেন কায়রো আমাদের প্রচুর টাকা সাহায্য করেছে অস্ত্র কিনতে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। 'শুনেছি।'

'ইউ নো, আমাদের অঞ্চলে ইসরাইল বর্তমানে এমন এক বিষফোঁড়া হয়ে উঠেছে যে ওটাকে কেটে বাদ না দিলে আর চলছে না। কিছু আরব দেশ এতদিন ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব না

দিলেও এখন দেয়। প্রায় সবাই আজ একমত এ ব্যাপারে। তাই ওরা সাহায্য করছে আমাদের। কারণ ইসরাইলকে উচিত শিক্ষা দেয়ার এ এক পরম সুযোগ। আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ওরা নিশ্চই চুপ করে বসে থাকবে না, আক্রমণ করবে। এই ছুতোয় জর্ডান, সিরিয়া, ইজিপ্ট একসাথে ইসরাইলকে আক্রমণ করবে, আরব ঐক্যের ডাক দেবে। আমরা আশা করছি এক এক করে অন্যরাও যোগ দেবে সে যুদ্ধে।'

থেমে সচিবকে আরেক রাউন্ড কফির নির্দেশ দিলেন উপদেষ্টা। হেলান দিয়ে বসলেন। কিছু সময় চোখ কুঁচকে ভাবলেন কি যেন। 'যাক্গে সেসব। যা বলছিলাম। ফ্রান্স রাজি হলো, কিন্তু মিশরকে সরাসরি এ ব্যাপারে জড়াতে নিষেধ করল তার ইউরোপীয় মিত্ররা নাখোশ হতে পারে ভেবে। তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে এগোতে পরামর্শ দিল। আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তাই করল ওরা। আম্মান ভিত্তিক বেশ নামকরা এক কোম্পানির মাধ্যমে এগোল। স্পাইডেক্স ইন্টারন্যাশনাল ওটার নাম।'

দ্বিতীয় কাপে চুমুক দিল রানা। 'তারপর?'

'ওটার চেয়ারম্যান জর্ডানী, কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান ব্রিটিশ।'

'ব্রিটিশ?' নড়ে বসল রানা। বিস্মিত হয়েছে।

'হ্যাঁ। তবে আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওই কোম্পানি আফ্রিকা, সাউথ ঈস্ট এশিয়া এবং মিডল ঈস্টের অনেক দেশে অতীতে অস্ত্র সরবরাহ করেছে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে। বর্তমানেও করছে। সন্দেহ করার মত কোন রেকর্ড নেই স্পাইডেক্সের।'

'আচ্ছা! নাম কি ভাইস চেয়ারম্যানের?'

'জর্জ কাপ্লওয়েট। চেয়ারম্যান আবদুল্লা হারিয়া।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'চিনতেন এদের?'

'আগে চিনতাম না। তবে কায়রোর কাছে কোম্পানির নাম

জানতে পেরে হারিয়াকে খুঁজে বের করে তার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করি আমরা। আম্মানে তার বাড়ি-অফিস, সবখানে লিসনিং ডিভাইস পেতে কড়া ওয়াচে রাখি কিছুদিন। এক সময় শিওর হলাম জেনুইন ব্যবসায়ী ওরা, ফাঁক-ফোকর নেই ভেতরে।'

'অন্যজন, জর্জ কাপলওয়েট? তারওপর...'

'না। তাকে এখনও চিনি না আমরা।'

সিগারেট ধরাতে গিয়েছিল ও, লাইটার ধরা হাত শূন্যে থেমে গেল। চোখ তুলে আবদুল্লাহকে দেখল। চাউনিতে প্রশ্ন।

'ব্যাপার হলো ফ্রান্সের সাথে স্পাইডেক্সের বেচাকেনার আলোচনা শুরু হওয়ার আগে থেকেই সে আফ্রিকায়। বড় এক অস্ত্র বিক্রির কাজ বাগাতে গিয়েছিল। তার জন্যে আমাদের কাজ ঠেকে থাকেনি, চেয়ারম্যানই যথেষ্ট, তাই খুব একটা গুরুত্ব দিইনি আমরা ব্যাপারটাকে। তাছাড়া আগেই বলেছি অন্যান্য রিজিয়নের মত মিডল ঈস্টের কয়েকটা দেশকে; বিশেষ করে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরান-ইরাক, দু'পক্ষের কাছেই অস্ত্র বিক্রি করেছে ওরা। তাই লোকটার অনুপস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামানো হয়নি।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। অন্যমনস্ক।

'তারপর, ফ্রান্স স্পাইডেক্সকে জানাল, মাল সরাসরি ওদের দেশ থেকে না নিয়ে অন্য কোন দেশ থেকে নিতে। আই ওয়াশ দেয়ার জন্যে আর কি! ঠিক হলো, ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার বড় অস্ত্র রফতানীকারক দেশ, ওখানেই ট্রান্সশিপমেন্টের ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের প্ল্যান জানতে পেরে ঢাকা প্রস্তাব দিল মাল বহনে তারা আমাদের বিনে ভাড়ায় জাহাজ দিয়ে সাহায্য করবে সাও পাওলো থেকে। খুব খুশি হলাম আমরা।

'আপনাদের শিপ, বাংলার গৌরব তখন মাল খালাস করে ওখানেই ছিল। ভয়েজ নিরাপদ করার জন্যে কিছু কিছু কাজ

করানো হলো ওটার। প্রায় দু'মাস লেগেছে তাতে। ফ্রান্সের তুলো থেকে আমাদের মাল অন্য এক জাহাজে সাও পাওলো গেল, ওখান থেকে বাংলার গৌরব...'

'সেব সব জানা আছে আমার,' রানা বাধা দিল। 'মাল যাতে নির্বিঘ্নে জায়গামত পৌঁছতে পারে সে জন্যে ওটাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সোজা পথে না এসে ঘুরে আসতে। অনেক পথ।'

'হ্যাঁ। আমাদের জানিয়েছে ঢাকা। আপনাদের সরকারের দূরদৃষ্টি দেখে খুশি হয়েছিলাম আমরা। কিন্তু... থেমে গেলেন উপদেষ্টা। ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিলেন।

'জাহাজ উধাও হওয়ার জায়গাটা পিন পয়েন্ট করা গেছে?' প্রশ্ন করল রানা। ঝুঁকে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল।

'হ্যাঁ, মোটামুটি,' তাঁর সহকারী, ইবনে আব্বাস বলল। মাঝবয়সী সে, মোটাসোটা। পাশে বসা ওমান প্রতিনিধিকে দেখিয়ে বলল, 'গালফ অভ ওমানের মোহনার কোথাও থেকে উধাও হয়েছে ওটা।'

'স্পাইডেক্সের চেয়ারম্যানের সাথে এ নিয়ে কথা হয়েছে আপনাদের?'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত ভাব ফুটল আবদুল্লার চেহারায়। 'সে নেই।'

চোখ কুঁচকে উঠল রানার। 'নেই মানে?'

'মারা গেছে। জাহাজ উধাও হয়ে যাওয়ার চারদিন পর হংকঙে এক লিফট দুর্ঘটনায় মারা গেছে হারিয়া। ও দেশেও ব্যবসা আছে তার, প্রায়ই আসা যাওয়া করত।'

অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবল ও। 'কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান?'

'তার কোন খোঁজ নেই। এখনও ফেরেনি আফ্রিকা থেকে।'

'কোথাকার রেসিডেন্ট সে?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল রানা।

উপদেষ্টা কপাল চুলকালেন। 'সুইটজারল্যান্ড, লন্ডন, রোম, নিউ ইয়র্ক, সবখানেই বাড়ি আছে তার শুনেছি। তবে ঠিকানা জানি না। আর এক জায়গায় বেশিদিন থাকেও না।'

'ফ্যামিলি?'

'নেই। হারিয়া বলেছে। ব্যাচেলর।'

'অর্থাৎ লোকটাকে ট্রেস্ করার কোন উপায় নেই!' মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'এমনকি তাকে চেনেন না পর্যন্ত আপনারা!'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে সুন্দর একটা ভিজিটিং কার্ড বের করলেন ভদ্রলোক। এগিয়ে দিলেন। 'এটা হারিয়ার দেয়া, কাপলওয়েটের এখানকার সলিসিটরের ঠিকানা। এখানে প্রয়োজনে তার কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস পাওয়া যাবে বলেছিল সে। কিন্তু...'

'পাননি,' বাধা দিয়ে বলল ও। 'এই তো?'

হতাশ চেহারায় মাথা দোলালেন তিনি। 'হ্যাঁ। প্রথমে তো এদের কী হোল্ডার অ্যাগনস্ট আমাকে দেখা দিতেই রাজি ছিল না। দুদিন ঘুরে অল্প সময়ের অ্যাপয়ন্টমেন্ট পেলাম। সে বলল, এ নামে কোন ক্লায়েন্ট তাদের নেই। চাপাচাপি করায় ওরা ওদের মক্কেলদের নামের লিস্ট দেখিয়েছে আমাকে, তাতে ছিল না এই নাম।'

কার্ডের নাম-ঠিকানা পড়ল রানা: মেন্ডলেসহ্যাম, হল অ্যান্ড অ্যাগনস্ট, থ্রী, থ্রগমর্টন স্ট্রীট, লন্ডন।

'আপনি শিওর এটা হারিয়ার দেয়া?'

'শিওর! তার এবং ফরাসীদের মধ্যে অস্ত্র কেনা নিয়ে যত বৈঠক হয়েছে, ছদ্ম পরিচয়ে তার প্রত্যেকটায় আমিও ছিলাম

ঈজিপশিয়ানদের সাথে। এটা হারিয়া আমাকে নিজহাতে দিয়েছে।'

'তাহলে?'

শ্রাগ করলেন তিনি ঠোঁট উল্টে। 'আল্লা মালুম, কিছুই মাথায় আসছে না আমার।'

আবার কার্ডটা দেখল ও বহু সময় ধরে। এর অর্থ কি, হারিয়া ব্লাফ দিয়েছে, না মেন্ডলেসহেম দিচ্ছে?

'বিপদ ঘটলে বাংলার গৌরবের ডিসট্রেস বীকন সিগন্যাল দেয়ার কথা ছিল। দিয়েও ছিল, কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্যে। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, তারপর থেমে গেছে। বিপদ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আমাদের ওখানকার প্রতিনিধি জাহাজ খোঁজার ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ওমান অ্যান্টি টেররিস্ট সংস্থার চীফ মেজর হ্যারি রোমান বাধা দিয়েছে। কাজ করতে দেয়নি।'

বিস্মিত হলো রানা। নামটা যথেষ্ট পরিচিত। 'মেজর রোমান আজও মাসকাটে?'

নীরবে মাথা দোলালেন আবদুল্লাহ।

'কেন?' ওমান প্রতিনিধির দিকে তাকাল ও। 'বাধা দিল কেন সে?'

হাত চিৎ করে অসহায় ভঙ্গি করল লোকটা। 'দিল। তার দেশের সীমার মধ্যে কোনরকম "অশুভ" তৎপরতা চালাতে দিতে রাজি নয় সে।'

'আচ্ছা! সে তাহলে জানে এখবর?'

'মনে হয়। কিছু বলেনি অবশ্য।'

'তাকে আপনি চেনেন মনে হচ্ছে?' আবদুল্লাহ বললেন।

আনমনে মাথা ঝাঁকাল ও। 'হাড়ে হাড়ে।' অতীত স্মৃতি ভিড় জমাতে শুরু করেছিল, জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল।

'লোকটা তাহলে ওমানী অ্যান্টি টেররিস্ট এজেন্সির চীফ?'

'হ্যাঁ। ব্যাপার কি, মিস্টার রানা?'

'না, কিছু না।'

আরও এক ঘণ্টা পর হোটেল ছাড়ল ও। চেহারা চিন্তিত। কপালে মৃদু কুঞ্চন। ওকে দেখে রিসেপশন ডেস্কের ওপাশে বসা দুই ক্লার্কের একজন সহজ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল। পিছনের ক্যাশিয়ার লেখা দরজা দিয়ে ঢুকে ফোনে দ্রুত কথা বলতে শুরু করল কারও সাথে।

জেরুজালেম। প্রধানমন্ত্রীর অফিস।

'এই লোক, মাসুদ রানা তাহলে এখন লন্ডনে?' হাতের তালুতে থুত্নি রেখে ঝুঁকে বসল বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

'জ্বি, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার,' বলল মোসাদ প্রধান। 'ফিলিস্তিনীদের সাথে মীটিঙ করছে। ওদের আলোচনা রেকর্ড করতে চেয়েছিলাম আমি, লোকও লাগিয়েছিলাম হোটেলরুমে ডিভাইস প্ল্যান্ট করতে। কিন্তু সুযোগ বের করা গেল না।'

'হুঁম! তাহলে, এখন কি করবেন ভাবছেন?'

'নজর রাখা ছাড়া তেমন কিছু এ মুহূর্তে করার নেই, স্যার,' চিন্তিত গলায় বলল বেন মেইর। 'তবে...মাসুদ রানার রেপুটেশনকে রীতিমত ভয় করি আমি। মনে মনে শ্রদ্ধাও করি। ভয় হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ওলটপালট না হয়ে যায় সব।'

যাহাল চীফ এলিয়াহুদ চশমার ওপর দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল তার দিকে। 'তেমন কিছুই হবে না, মিস্টার মেইর,' চিঁ-চিঁ করে বলল। 'শিওর থাকুন। তার আর যাই থাকুক, আমাদের ইয়োন্নিকে ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মত ক্ষমতা বা যোগ্যতা, কোনটাই নেই। কাজেই রিল্যাক্স।'

'মুশকিল হচ্ছে মানুষটা ঘাস খায় না,' বিড়বিড় করে বলল মেইর। কপালের ভাঁজ আরও গভীর হলো। 'ওর তৎপরতা ভাল ঠেকছে না আমার।'

বিকেল চারটে।

মেন্ডলেসহ্যাম, হল অ্যান্ড অ্যাগনস্টের অফিস বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়ে ঠিকানা মিলিয়ে নিল ব্রিটিশ টেলিকমের কভারল পরা এক লাইনম্যান। লালচে কোঁকড়া চুল। নাকের পাশে বড়, লালচে এক আঁচিল।

বিল্ডিংটা ভিক্টোরিয়ান, ক্লান্ত চেহারা। টাইলের মেঝে, প্যানেলিঙ করা দেয়াল। দুটোরই ভার্নিশ কোটিং প্রয়োজন জরুরী ভিত্তিতে। পুরো নিচতলা নিয়ে সলিসিটরের অফিস। দরজা খুলে রিসেপশন এরিয়ায় ঢুকল লোকটা। কড়া মেক-আপ করা মাঝবয়সী রিসেপশনিস্ট ঘুরে তাকাল। গম্ভীর। 'ইয়েস?'

লোকটা হাসল। 'টেলিকম, মিস্। তোমাদের ফল্ট চেক্ করতে এসেছি।' আইডি কার্ড দেখাল সে নিজের।

'কিসের ফল্ট? আমি তো কোন অভিযোগ করিনি।'

'না, তুমি নও। তোমাদের এক মক্কেল করেছে চেলসি এলাকা থেকে। অনেক চেষ্টা করেও নাকি লাইন পাচ্ছে না এখানকার।'

'কই, আমাকে কিছু বলেনি তো কেউ!'

মারফতী হাসি দিল সে। 'কি করে বলবে, লাভ, যদি লাইনই না পেল? প্রয়োজনে আমার বসকে ফোন করতে পারো তুমি।'

শ্রাগ করল মহিলা। 'তার কোন দরকার দেখি না।'

'তবু, করোই না,' কার্ডটা এগিয়ে দিল সামনে। 'এই যে নাম্বার। শিওর হয়ে নেয়া ভাল।'

'ও কে!' ইচ্ছের বিরুদ্ধে রিসিভার তুলে নিল রিসেপশনিস্ট, নাম্বার দেখে পাঞ্চ করল। মনে মনে হাসল লাইনম্যান। বেশ কিছুক্ষণ পর ফোন রেখে বিরক্ত চোখে তাকাল মহিলা। 'তোমাদের ডিপার্টমেন্ট ভীষণ ইনএফিশিয়েন্ট। একটা কানেকশন দিতে এত সময় লাগে অপারেটরদের, এরমধ্যে বোধহয় চাঁদ থেকেও ঘুরে আসা যায় এক চক্কর।'

'কি হলো? লাইন পাওনি?'

'পেয়েছি!' চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল রিসেপশনিস্টের। 'ঠিকই আছে, যাও, তুমি তোমার কাজ শুরু করো।' একটা ছোট আয়না বের করে চেহারা দেখতে লেগে পড়ল সে।

লাইনম্যানও শুরু করে দিল নিজের 'কাজ'। মহিলার সামনের রিসেপশন সুইচবোর্ড পরীক্ষার ছলে রুমের অ্যালার্ম সিস্টেম দেখে নিল ভাল করে। ওটা ইনফ্রারেড ডিভাইস। এ ধরনের পুরানো, বড় ভবনের নিরাপত্তার কাজে বেশ কার্যকর জিনিস। খরচও কম। ডেস্কের ওপরে, দেয়ালে সেট করা আছে ওটার সেনসর 'আই'। দেহের উত্তাপ পেলেই টকটকে লাল ব্লিঙ্ক দিতে শুরু করে জিনিসটা। এখন অবশ্য ঘুমিয়ে।

ডেস্কের পিছনের দরজা খুলে ভেতরের করিডরে চলে এল সে। রিসেপশনিস্ট তখনও আয়নায় মগ্ন। করিডরটা বেশ লম্বা, দু'দিকে প্লাইউডের পার্টিশন করা ছোট ছোট অনেকগুলো অফিস। শেষ মাথায় কোম্পানির তিন পার্টনারের বড় তিন শানদার অফিস।

কিন্তু লাইনম্যান যা খুঁজছে, তা দেখা গেল না কোথাও।

এক এক করে প্রত্যেকটা রুমে ঢুঁ মারল সে, সবার বিরক্তি উৎপাদন করে সবগুলো টেলিফোন সেট খুলল, জোড়া লাগাল। কাজের ফাঁকে দেখে নিল রুমগুলোর ইনফ্রারেড সেনসরের পজিশন। সাড়ে পাঁচটায় ছুটি হলো। মেয়ে সেক্রেটারিরা দলে দলে

বেরিয়ে এল অফিস ছেড়ে, সবার হাতে একগাদা করে ফাইল। রীতিমত হাট বসে গেল করিডরে। হাসি-ঠাট্টা, এটা-ওটা আলাপ করছে। বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত সবাই। ওদের সাথে সামনের দিকে চলে এল লাইনম্যান।

যাওয়ার আগে গোপনীয় সমস্ত ফাইলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত মেয়েরা। তখনই ব্যাপারটা চোখে পড়ল লাইনম্যানের। আগে দেখেনি; রিসেপশন ডেস্কের সাথেই ছোট একটা দরজা, প্যানেলিঙের খাঁজে এমনভাবে সেট করা আছে, যে জানে না, তার বোঝার উপায় নেই। ওটা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে ওরা।

মেয়েদের ভিড়ে মিশে ব্যস্তবাগীশ লাইনম্যানও ঢুকে পড়ল। তার আগে আড়চোখে এক নজর দেখে নিয়েছে রিসেপশনিস্টকে। এদিকে খেয়ালই নেই, নিজের গোছগাছে ব্যস্ত। দরজাটা দিয়ে ঢুকেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি, তারপর খানিকটা স্পেসের ওপাশে রড এক রুম। স্যাঁতসেঁতে। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে অসংখ্য ফাইলিঙ র‍্যাক দেখা যাচ্ছে। দরজা পুরু লোহার–ওটা স্ট্রংরুম।

ভেতরে ঢুকল না লাইনম্যান। সিঁড়িরুমের দেয়ালে টেলিফোন লাইন খোঁজার ভান করল কিছু সময়। চোখ স্ট্রংরুমে। মেয়েরা যে যার ফাইল নির্দিষ্ট র‍্যাকে রেখে বেরিয়ে আসছে। শেষ মেয়েটি বেরিয়ে এসে ভারী দরজা বন্ধ করে দিল। আর কিছু দেখার নেই তার, ঘুরে মেয়েটির আগে আগে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে।

'তুমি এখনও কি করছ?' তাকে দেখে বিস্মিত হলো রিসেপশনিস্ট। 'নিচে গিয়েছিলে কেন?'

'ওদিকে লাইন আছে কি না দেখতে, লাভ,' হাসল সে দাঁত বের করে। 'লাস্ট মিনিট চেকিং। চলি, কাজ শেষ। আশা করি লাইন পেতে আর অসুবিধে হবে না তোমার মক্কেলদের।'

রানা এজেন্সি। সন্ধে গড়িয়ে গেছে।

নিজের অফিসরূমে মুখোমুখি বসে আছে রানা ও আল-ফাতাহ্‌র সামরিক উপদেষ্টা, হানান আবদুল্লাহ্‌। তার পাশে একটু আগে হল অ্যান্ড অ্যাগনস্ট থেকে ঘুরে আসা 'লাইনম্যান', তৌফিক আহমেদ। রানা এজেন্সির লন্ডন ফিল্ড অফিসার। লালচে কোঁকড়া চুলের উইগ খুলে টেবিলে রাখা, আসল চুল তার কুচকুচে কালো। নাকের পাশের আঁচিল গায়েব।

তার ব্রিটিশ টেলিকমের আইডি কার্ড একেবারে ভুয়া—মেড ইন রানা এজেন্সি। এ ধরনের জরুরী কাজের জন্যে কেনা বাচ্চাদের খেলনা প্রিন্টিং মেশিনে ছাপা। ওটায় যে ফোন নম্বর লেখা, তাও এখানকার। লাইনম্যানের বসের অপারেটরের দায়িত্ব পালন করেছে এজেন্সির স্থানীয় চীফের পি.এস। 'ব্যস্ততা বোঝানোর জন্যে ইচ্ছে করে অ্যাগনস্টের রিসেপশনিস্টের সময় নষ্ট করেছে সে খানিকটা। 'বস্‌' ছিল স্বয়ং মাসুদ রানা।

'র‍্যাকে কোন নেম স্টিকার দেখোনি তুমি?' প্রশ্ন করল ও।

'জ্বি-না,' বলল তৌফিক। 'খুব সম্ভব রেফারেন্স নাম্বার অনুযায়ী ফাইল মেইনটেন করে ওরা।'

'তাহলে, কি কি হলে চড়াও হতে পারি আমরা?' রানার কথা শুনে মনে মনে হাসলেন হানান আবদুল্লাহ্‌। ওর কাজের পদ্ধতি বেশ প্রভাব ফেলেছে তাঁর ওপর। 'এক সেট হ্যান্ড হেল্ড পিআরও ত্রিশ রেডিও স্ক্যানার হচ্ছে এক নম্বর, কেমন?'

মাথা দোলাল তৌফিক। 'জ্বি, মাসুদ ভাই।'

'ও জিনিস কেন?' ফস্‌ করে বলে বসলেন উপদেষ্টা। আর কোন্‌ ওস্তাদী রানা দেখাতে যাচ্ছে, না জানা পর্যন্ত শান্তি হচ্ছে না।

'পুলিস ট্রান্সমিশন শোনার জন্যে,' বলল ও। লন্ডন সিটি পুলিস

হেডকোয়ার্টার্স মেসেজ ট্রান্সমিট করে ৪৫১.৭৭৫ ইউএইচএফ-এ, তথ্যটা ওর জানা আছে। মোবাইল প্যাট্রল আর পুলিস সার্জেন্ট বীটের সময় ১৫৪.০১০ থেকে ১৫৬.৭৭৫ মেগাহার্সের মধ্যে রিসিভ করে যে-কোন সঙ্কেত। ও দিকে খেয়াল রাখতে হবে ওকে। নইলে সমস্যা হয়ে যাবে।

তবে সলিসিটরের অফিস অন্য অনেক বেসরকারী অফিসের মত নন্-প্রায়োরিটি সম্পত্তি। অ্যাগনস্টের ইনফ্রারেডের সঙ্কেত পেলেও সাড়া দিতে সময় নেবে পুলিস।

'আর কি?' মাথা ঝাঁকাল ও। 'একটা কবুতর বা মুরগি। নাহ্, কবুতরই ভাল। মুরগি আওয়াজ করে বেশি। এবার,' তৌফিকের দিকে তাকাল। 'ওদের অফিসের ডিটেইলড্ ফ্লোর প্ল্যান এঁকে ফেলো তুমি। কোন রুমে কোথায় সেনসর, দেখাও।'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল তৌফিক।

রাত সাড়ে এগারোটা। নির্দিষ্ট বিল্ডিঙের উল্টোদিকের এক কার পার্কে এসে থামল রানার সিয়েরা। ও আর তৌফিক নামল ভেতর থেকে। তৌফিকের হাতের ছোট থলেতে একটা কবুতর। নড়ছে। গাড়ি লক্ করল রানা, তারপর দু'জনে মিলে রাস্তা পার হয়ে ভিক্টোরিয়ান বিল্ডিংটার সামনে পৌঁছল। বুক পকেটে রাখা স্ক্যানার অন্ করল রানা, থেকে থেকে ক্যানকেনে গলা শোনা যাচ্ছে ওটায়। হেড কোয়ার্টার্সের সাথে কথা বলছে মোবাইল প্যাট্রল ইউনিটগুলো।

সলিসিটরের এবং তার পাশের বিল্ডিঙের মধ্যে সরু একটা গলি, ওটা ধরে পিছনদিকে চলে এল ওরা। শেষ মাথায় কোমর সমান উঁচু রেলিং দিয়ে গলিটা ঘেরা, ওপাশে ডেড বেসমেন্ট এরিয়া। রেলিং টপকে ভেতরে চলে এল। হল অ্যান্ড অ্যাগনস্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরের এক জানালার সামনে থামল। একটা ডাস্টবিন

টেনে নিয়ে এসে ওটার ওপর উঠল তৌফিক, পকেট থেকে সরু ব্লেডের চওড়া প্যালেট কিচেন নাইফ বের করে জানালার স্যাশ লক্ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রানার নজর রাস্তায়, কান রেডিওতে।

দু'মিনিট পর রিসেপশনিস্টের অফিসে পৌঁছল ওরা। বডি হীট টের পেতেই সেনসরের লাল LED লাইট পিট্ পিট্ করতে শুরু করল। সঙ্কেতটা টেলিফোন লাইন হয়ে প্রথমে পৌঁছবে এদের সিকিউরিটি ফার্মে, ওখান থেকে পুলিস স্টেশনে, জানা আছে রানার।

লাইটটার উদ্দেশে চোখ টিপল তৌফিক। 'পরে দেখা হবে। এখন তাড়া আছে, ভায়া।'

ব্যস্ত পায়ে বেজমেন্টে নেমে গেল সিঁড়ে ভেঙে। ফ্লোর প্ল্যান দেখে রানা চলল সিনিয়র সেক্রেটারির অফিসের দিকে। খুব দ্রুত একটা জানালা সনাক্ত করল তৌফিক, ওটার ওপাশেই রয়েছে বাইরের রেলিং ঘেরা গলি। উল্টোদিকে, স্ট্রংরূমের দরজার ওপরের সেনসর ততক্ষণে পিট্-পিট্ শুরু করে দিয়েছে। একটা বাতিল চেয়ার নিয়ে ওটার সামনে দাঁড়াল সে, ঝটপট সেনসর 'আই'র প্লাস্টিক কভার খুলে তার ভেতরে খানিকটা পার্সেল টেপ লাগিয়ে জায়গামত বসিয়ে দিল কভার। পিট্পিটানি বন্ধ হয়ে গেল সেনসরের, কানা হয়ে গেছে। এখন দশজন রূমে এসে দাঁড়ালেও সাড়া দেবে না ওটা। সন্তুষ্ট হয়ে ঘুরে দাঁড়াল তৌফিক চেয়ার জায়গায় রেখে।

ওদিকে রানা রেডিও স্ক্যানার 'অন' রেখে সিনিয়র সেক্রেটারির ডেস্ক ঘাঁটছে ব্যস্ত হয়ে, তবে খুব সতর্কতার সাথে। কিছু ধরার আগে দেখে নিচ্ছে সেটা কোথায়, কিভাবে রাখা আছে। প্রায় দশ মিনিট লাগল জিনিসটা পেতে। একটা ক্রস রেফারেন্স ইনডেক্স বুক। জর্জ কাপলওয়েটের ফাইল নম্বর লেখা আছে ওতে। এক

পলক দেখেই মুখস্থ করে নিল রানা।

কাজ সেরে এসে একই ডেস্কের অন্য সমস্ত ড্রয়ার হাতড়াতে লাগল তৌফিক। ডানদিকের মাঝের ড্রয়ারে পাওয়া গেল FILES লেখা বড় এক চাবি। স্ট্রংরুমের চাবি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে বলে রোজ চাবি টানাটানির ঝামেলা পোহাতে চায় না এরা।

মনে মনে হাসল রানা। দারুণ সিকিউরিটি সিস্টেম।

ঠিক সেই মুহূর্তে চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল স্ক্যানার। পুলিস স্টেশন থেকে একটা সেন্ট্রাল স্টেশন অ্যালার্ম বাজছে বলে জানানো হচ্ছে মোবাইল ইউনিটকে, ব্যাপার চেক করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ওটা একটা অফিস—মেন্ডলেসহ্যাম, হল অ্যান্ড অ্যাগনস্ট।

'মাসুদ ভাই, কেটে পড়ি চলুন।'

'হ্যাঁ, চলো।' চাবিটা পকেটে ভরে রাখল ও।

স্যাশ উইন্ডো দিয়ে বেরিয়ে এল দু'জনে। পাল্লা টেনে নামিয়ে দিল তৌফিক, তবে পুরোটা নয়। ছয় ইঞ্চি ফাঁক রেখে। ফাঁক দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিল হতভম্ব পাখিটাকে। পুলিস স্কোয়াড কার পৌঁছল ইনফ্রারেড সেনসরের সিগন্যাল শুরু হওয়ার ষোলো মিনিট পর। ওরা তার ঢের আগেই পৌঁছে গেছে গাড়িতে। বসে আছে।

দীর্ঘ নীরবতার পর পুলিস কোম্পানির কী-হোল্ডারকে ফোন করল। এল সে। অফিসারদের সাথে ঘুরে দেখল অফিস। ওদিকে গাড়িতে বসে স্ক্যানারে ওরা একটা মোটা গলার রিপোর্ট শুনতে পেল পরিষ্কার, স্টেশনে রিপোর্ট করছে। 'ফলস্ অ্যালার্ম, সার্জ। নিচতলার জানালা খোলা পেয়ে ঘুমকাতুরে এক কবুতর ঢুকে পড়েছে ভেতরে, আর কিছু নয়। ওটার বডি হীটে মাথা খারাপ হয়ে গেছে সেনসরের। ভাল কথা, সার্জ, তোমার গিন্নি পিজিয়ন পাইর ভাল কোন রেসিপি জানে নাকি?'

পুলিস চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পর আবার এল রানা ও

তৌফিক। পিছনের রেলিঙের সাথে দড়ি বেঁধে ঝুলে নেমে গেল সরু বেজমেন্ট এরিয়ায়, আইলেভেলের নিচে। এখানে সুবিধেজনক যে জানালা দেখে রেখে গিয়েছিল তৌফিক, ওটা দিয়ে ঢুকে স্ট্রংরুমের দরজা খুলল। অন্ধ সেনসর টের পেল না কিছু।

রুমটা মাঝারি। ওয়াল-টু-ওয়াল র‍্যাকে থরে থরে সাজানো আছে শত শত ফাইল। কোড নাম্বার জানা না থাকলে ওর ভেতর থেকে বিশেষ একটা ফাইল বের করা অসম্ভব কাজ। রানার জানা আছে, কাজেই কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না।

সঙ্গে আনা মিনক্স মাইক্রো ডকুমেন্ট ক্যামেরা দিয়ে নির্দিষ্ট ফাইলের প্রতিটা পাতার দুটো করে ছবি তুলে নিল ও।

পরদিনই অজ্ঞাতকারণে জর্জ কাপলওয়েটের ফাইল 'ক্লোজ' করে দিল হল অ্যান্ড অ্যাগনস্ট, নষ্ট করে ফেলা হলো কাগুজে ডকুমেন্টস। থাকল কেবল ওসবের মাইক্রোফিল্ম করা রেফারেন্স। ইনডেক্সের ক্রস রেফারেন্স থাকল আগের মতই, ওটা নষ্ট করার নিয়ম নেই।

খবরটা মাসুদ রানার জানা হলো না।

পাঁচ

জেরিকো। পশ্চিম তীর।

পিছনে হালকা পায়ের শব্দে পর্দার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে

ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। কফি নিয়ে এসেছে গৃহকর্ত্রী। অল্পবয়সী এক স্কুল শিক্ষিকা। নীল নয়না। নাম তানজিন। কাপ টেবিলে রেখে সোজা হয়ে মৃদু হাসল। 'ও আসছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ইঙ্গিতে জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তা বোঝাতে চাইল। 'অনেক সৈন্য মনে হচ্ছে!'

গম্ভীর হলো শিক্ষিকা। ওর পাশ ঘেঁষে গিয়ে পর্দা সামান্য সরিয়ে উঁকি দিল। একটু পর মাথা দোলাল। 'অস্বাভাবিক কিছু নয়। ওরা সব সময় দল বেঁধে ঘোরে।'

কাপ তুলে নিয়ে দাঁড়িয়েই চুমুক দিল রানা। এক চোখ বাইরে। রাস্তায় গিজ গিজ করছে মানুষ। বাজার বসেছে সদর রাস্তায়। ওর মধ্যে ছোটাছুটি করে খেলছে আরব শিশুরা। কারবাইন কাঁধে টহল দিচ্ছে ইসরাইলী সৈন্য। কঠোর, নির্বিকার চেহারা। সবকিছুর ওপর কড়া নজর।

জেরিকো শহরটা বেশি বড় নয়। বাড়িঘর সব প্রাচীন। শহরের পুব প্রান্ত এটা, আদি শহর। ঘিঞ্জি। পরে যেটুকু বেড়েছে শহর, পশ্চিমদিকে বেড়েছে। তাও সেরকম নয়। বাড়িঘরের তুলনায় মানুষ বেশি মনে হয়। এর অবশ্য কারণও আছে। '৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকার মধ্যস্থতায় আরাফাত-বেগিনের শান্তি চুক্তির কয়েক মাস পর জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার যে অংশটুকু ইসরাইল ফিলিস্তিন স্বায়ত্বশাসনে ছেড়ে দিয়েছে, জেরিকো তার রাজধানী। লেবানন, সিরিয়া, জর্ডানসহ অন্যসব জায়গায় যত অভিবাসী ফিলিস্তিনী আছে, প্রায়ই কিছু কিছু করে ফিরে আসছে। জেরিকোতে আসছে তাদের বেশিরভাগ।

স্বায়ত্বশাসন দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু পাহারাদারি ছাড়েনি ইসরাইলী সৈন্য। প্রতিমুহূর্ত আরবদের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়। সামান্য এদিক-ওদিক দেখলেই শহর ঘিরে ফেলে, বন্ধ করে দেয়

রাস্তাঘাট। জেরুজালেমের খুব কাছে বলে বিশেষ করে জেরিকোর ওপর কড়া নজর ইসরাইলীদের। পথে পথে অসংখ্য রোড ব্লক। বেশ ঝক্কি পোহাতে হয়েছে রানাকে ভেতরে পৌঁছতে।

ও ব্রিটিশ ইহুদী জেনেও তেমন প্রভাবিত হয়নি ব্যাটারা। লন্ডন, গ্লাসগো, বার্মিংহাম আর কিয়েভের ইহুদী কমিউনিটির চ্যারিটি ফান্ড যে রানার কাছ থেকে নিয়মিত মোটা টাকার চাঁদা পেয়ে থাকে, তার দু'চারটা রিসিপ্টও বিশেষ কাজে আসেনি। দফায় দফায় ওদের অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জান পেরেশান হয়ে গেছে।

তবু রক্ষা যে শেষ পর্যন্ত সোজা রাস্তায় ঢোকা গেছে। রানা ব্রিটিশ এক স্যানিটারি ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার, এ অঞ্চলে বাজারের খোঁজে এসেছে বলে ছেড়ে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

কাপ রেখে তানজিনকে ধন্যবাদ জানাল ও। সোফায় বসে সিগারেট ধরাল। শিক্ষিকা বেরিয়ে যেতে নজর বোলাল ঘরের চারদিকে।

বাড়িটা বেশ পুরানো। চারতলা। দোতলায় থাকে এদের পরিবার। তানজিনের স্বামী ওমর গোপন আল-ফাতাহ্‌র সংগঠক। ইসরাইলীদের তৎপরতার জন্যে খুব সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয় এদের। শুধু 'খুব' বললে ভুল হবে, অসম্ভব সতর্কতার সাথে। সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই সর্বনাশ। অবশ্য ওমরের আরেক পরিচয় আছে, এখানকার মোটামুটি বড় স্যানিটারি ওয়্যার ব্যবসায়ী সে। কাজেই তার সাথে ওর দেখা করতে আসায় সন্দেহজনক কিছু নেই। কেবল ওমরের সাথেই নয়, রানা এসেছে বহুদিনের ঘনিষ্ঠ আরও এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে।

অপেক্ষা করতে করতে অস্থির ও, দুপুর গড়িয়ে যেতে শুরু করেছে, তখনই এল সে। দরজায় দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে

দেখল ওকে। তারপর ছুটে এসে আলিঙ্গন করতে গিয়ে কোলেই তুলে ফেলল। 'স্যার! বস্! সত্যি তুমি এসেছ? এতবছর পর মনে পড়ল আমাদের?'

কাঁধ ধরে তাকে খানিকটা পিছনে সরিয়ে দেখল রানা। মুখে মিটিমিটি হাসি। 'কেমন আছ, আতাসী?'

'ভাল, বস্। তুমি কেমন আছ?'

'দেখতেই পাচ্ছ। বোসো। মার্সিয়ার খবর কি?'

'খুব ভাল, বস্। খুব ভাল। আমার পাঁচ নম্বর ছেলের মা হতে যাচ্ছে ও। ওর জন্যে দোয়া কোরো।'

চোখ কপালে উঠল রানার। 'সে কি! এবার দয়া করে রেহাই দাও বেচারীকে, আর কত?'

'কি যে বলো না, বস্, এত তাড়াতাড়ি? আমার পুরো এক ব্যাটেলিয়ন চাই, আমি হব ওদের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসরাইলীদের সাথে লড়ব, প্রয়োজনে মরব, তবে না জন্ম সার্থক হবে।'

হাসল ও। 'আগের মতই আছ তুমি, বেদুইন।'

'হ্যাঁ, বস্! এখনও সেই দুম্বাই আছি। ক'দিনে সপ্তা হয় জানি না।'

অনেক পুরানো রসিকতা। হাসল দুজনে। রানা সিগারেট ধরাল আতাসীকে একটা দিয়ে। তানজিন কফি নিয়ে এল। ও বেরিয়ে যেতে মুখ খুলল রানা। 'তুমি এখানে কতদিন থেকে আছ, লেফটেন্যান্ট?'

'অনেকদিন থেকে, বস্। গেরিলা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি এদের।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল ও। 'তোমাকে আমার দরকার।'

'বলে ফেলো, বস্। বান্দা হাজির তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে নয়,' কঠোর হয়ে উঠল রানার চেহারা।

'ফিলিস্তিনের জন্যে।'

কফিতে চুমুক দিল বেদুইন। 'যে জন্যেই হোক, বস্, তুমি আমার খোঁজে এসেছ, আমার তাই যথেষ্ট। এবং আমাকে তুমি আজও মনে রেখেছ বলে কৃতজ্ঞ আমি। বলো এবার, কাজটা কি?'

আধঘণ্টা পর। পায়চারি করে বেড়াচ্ছে আতাসী, চিন্তায় চোখমুখ কুঁচকে আছে। 'আমি তো এখানেই আছি, বস্। কই, এতবড় খবর, কিছুই তো জানি না। কেউ বলেনি।'

'ফিলিস্তিন হাই কমান্ড ইচ্ছে করেই চেপে গেছে, আতাসী। জানাজানি হলে যোদ্ধারা হতোদ্যম হয়ে পড়তে পারে, মন ভেঙে যেতে পারে ওদের, তাই চেপে যাওয়া হয়েছে,' রানা বলল।

'তাই হবে।' দাঁড়িয়ে পড়ল বেদুইন। 'তুমি তাহলে এখন...'

ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'হ্যাঁ। তুমিও যাবে আমার সাথে।'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার। ঝুঁকে কুর্নিশ করল। 'যথা আজ্ঞা, মহামান্য সম্রাট।' পরক্ষণে চেহারা করুণ হয়ে উঠল। 'কিন্তু, বস্, আমি যে সাঁতার জানি না! সাগর তো অনেক পরের কথা, পানির নাম শুনলেই কলজে শুকিয়ে আসে।'

'বুড়ো হতে চললে অথচ সাঁতার শেখোনি এখনও, এ কেমন কথা?' কড়া গলায় বলল ও। পরক্ষণে স্বর নামাল। 'ঘাবড়িয়ো না। সে জন্যে সমস্যা হবে না।'

'বাঁচালে!'

'আরও কয়েকজনকে চাই আমার,' রানা সিগারেট ধরাল। 'তোমার নিজ হাতে ট্রেইনডদের মধ্যে থেকে। কি ধরনের বুঝতেই পারছ।'

বসে ওর প্যাকেট থেকে সিগারেট নিল লে. আতাসী। ধরাল। 'তাতে সমস্যা হবে না। কিন্তু তার আগে সুপিরিয়রদের

অনুমতি...'

'কিচ্ছু দরকার নেই। ওসব ব্যবস্থা করেই তোমাকে খবর দিতে বলেছি ওমরকে। তোমার ডিটাচমেন্ট অর্ডার এতক্ষণে জায়গামত পৌঁছে গেছে।'

'ও, তাহলে তো আর কোন সমস্যাই রইল না। আমার ক্যাম্পে চলো তাহলে। দেখেশুনে যাকে উপযুক্ত মনে হবে...'

অস্থায়ী ব্যারাকের টানা বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে সার্জেন্ট দারভিশ হামাম। স্ফিংসের মত অভিব্যক্তিহীন চেহারা। ইয়া পেশীবহুল দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা। ডান কব্জির ওপরদিকে টাট্টু করা আছে: আল্লাহ এবং নিজের প্রতি সবসময় বিশ্বস্ত থেকো।

বাইরে প্রচণ্ড রোদ। বালি ফুটছে বোধহয়। লু হাওয়া বইছে। চোখমুখ পুড়ে যাওয়ার অবস্থা। জর্ডান নদী ও জারকা নদীর মাঝখানে ওদের এই ক্যাম্প জর্ডানের ভেতর। বহু বছরের বৈরিতা ভুলে আম্মান ফিলিস্তিনীদের সাহায্যে হাত বাড়িয়েছে অবশেষে, ওদের ট্রেনিঙের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে প্রায় পঁচিশ বর্গমাইলের মত এই মরু প্রান্তর।

ব্যারাকের পিছনের বিস্তীর্ণ ড্রিল গ্রাউন্ডে ট্রেনিং চলছে। তবে হামামকে ছুটি দেয়া হয়েছে আজ। খুব গুরুত্বপূর্ণ এক অতিথি আসছে এখানে, সেই জন্যে। ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট লে. আতাসী তাকে নিয়ে পৌঁছবে যে কোন সময়। তার সাথে জামাল শামলুও ছুটি পেয়েছে আজ। যদিও আজ ওর এমনিতেই ছুটি। ওর ট্রেনিং কাল শেষ হয়ে গেছে। তবে ওপর থেকে যখন ওদের দুজনকে রেস্ট নিতে বলা হয়েছে, তখন নিশ্চই এরমধ্যে অন্য কিছু আছে বলে হামামের মনে হচ্ছে।

বেচারা শামলু, ভাবল সার্জেন্ট। চার বছর বয়স থেকে দুনিয়ায় একদম একা সে। কেউ নেই। কিচ্ছু নেই নিজের বলে। ফিলিস্তিন আচমকা যেদিন ইসরাইল হয়ে গেল, তাড়া খেয়ে জর্ডানে পালিয়ে গেল ওর মা-বাবা। তারাও তখন অল্পবয়সী। সুবিধে হলো না ওদেশে, ফিলিস্তিনী রিফিউজির সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে উৎকট ঝামেলা ভেবে জর্ডান তাদের তাড়িয়ে দিল। বহু ফিলিস্তিনী মরল জর্ডানী সৈন্যের গুলিতে।

তারপর লেবানন। ওরাও কম অত্যাচার করেনি। '৭৩ সালে পিএলও গেরিলার ঘাঁটি সন্দেহে সাবরা ও শাতিলা রিফিউজি ক্যাম্পে বিমান হামলা চালাল লেবানীজ এয়ার ফোর্স। ধ্বংস করে দিল সব, শত শত নিরীহ ফিলিস্তিনী মরল। কয়েক বছর পর আবার সেই একই ট্রাজেডি। এবার ইসরাইলী সৈন্যরা হামলা চালাল ওই দুই ক্যাম্পে। একা হয়ে পথে নামল জামাল।

ছোট্ট, অসহায় শিশু। খিদে পেলে কাঁদতে বসে যায়, হাজারো ফিলিস্তিনীদের মধ্যে মা-বাবাকে খুঁজে বেড়ায় ওর দু'চোখ। মরণ যে তাদের চিরতরে নিয়ে গেছে, বুঝতে চায় না। ছয় বছর পর্যন্ত প্রতিবেশীদের ফাই-ফরমাশ খেটে কেটেছে, তারপর পথে নামতে হয়েছে পেটের দায়ে। 'বড়' হয়ে গেছে, কাজেই ওকে খাওয়ানোর পিছনে বাড়তি খরচ বন্ধ করে দিল তারা। এক টুকরো রুটি বাড়তি খরচ করাও তাদের জন্যে বিলাসিতা ছিল। অপব্যয় ছিল।

বৈরুতের আইন আল-রামানেহ্ স্কয়ারের অজস্র হকারের সাথে ভিড়ে গেল শামলু বাধ্য হয়ে। চুইঙ গাম, কেক, সিগারেট বিক্রি করে দিন চলত। দু'বার খেত দিনে–সকালে আর রাতে। দুপুরে খেতে গেলে পুঁজিতে হাত পড়বে, তাই স্কয়ারের দামী দামী রেস্তরাঁর কাঁচের জানালায় নাক ঠেকিয়ে পয়সাওয়ালাদের খাওয়া দেখত তখন, ওসবের স্বাদ আর গন্ধ কল্পনা করত, ওতেই ভরে

যেত পেট। বর্ণমালার বই কিনে আরবী আর হিব্রু লিখতে-পড়তে শিখেছে নিজে নিজে, ডাস্টবিনে বিদেশীদের ফেলে দেয়া খবরের কাগজ পড়ে একটু একটু করে জেনেছে নিজেদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।

ফিলিস্তিন স্বায়ত্বশাসন পাওয়ার পর রামাল্লা হয়ে জেরিকো আসে ও, নাম লেখায় আল-ফাতায়। ক্যাম্পে পাশাপাশি থাকে শামলু আর দারভিশ। আগে প্রায় রাতেই ওর কান্নায় বা গোঙানিতে ঘুম ভেঙে যেত তার। এখন অবশ্য পরিস্থিতি বদলেছে, ট্রেনিঙের সাথে পাল্লা দিয়ে কমে গেছে ওসব। অনেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে যুবক। চাউনি এত শীতল-কঠোর হয়ে উঠেছে যে দেখলে একেক সময় তার মত পাথর হৃদয় মানুষের বুকও কেঁপে ওঠে।

হায়রে ফিলিস্তিন, ভাবল সে, আর কত রক্ত চাই তোমার? ছেলেবেলায় বড়দের মুখে পূর্বপুরুষদের দুঃখ-কষ্টের ইতিহাস শুনেছে দারভিশ। বড় হয়ে ক্লাসে পড়েছে। দুর্বল বলে ফিলিস্তিনীদের সাথে যে প্রবঞ্চনা, যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে পৃথিবী, তার জানামতে এমন নজির দ্বিতীয়টা নেই ইতিহাসে।

ইহুদীদের নিজেদের কোন দেশ ছিল না, দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই চিন্তা-ভাবনা চলছিল কোথাও ওদের খানিকটা জায়গা ছেড়ে দেয়ার। মোটামুটি ধারণা দেয়া হয়েছিল পুব আফ্রিকার আজকের স্বাধীন দেশ উগান্ডা হবে ওদের দেশ, ২০০০ সাল নাগাদ। স্বাধীনতা দেয়া হবে ইহুদীদের। কিন্তু নোংরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কী আজব রাজনীতির খেলা, তাদের গোপন নির্দেশে ইহুদীরা পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দলে দলে ফিলিস্তিনে এসে জড়ো হতে শুরু করল।

আগে থেকে সামান্য কিছু ছিল, দিনে দিনে দল ভারী হতে লাগল ওদের। ইংল্যান্ড এবার করল চরম বিশ্বাসঘাতকতা। '৪৮ সালে ফিলিস্তিনের মাঝ বরাবর রেখা টেনে দিয়ে ঘোষণা করল একদিকে হবে ফিলিস্তিন, অন্যদিকে ইসরায়েল। ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হলো মধ্যপ্রাচ্যে, কিন্তু শক্তির দম্ভে মত্ত ডকট্রিন-ট্রুম্যান আমল দিল না।

ইসরায়েলকে স্বাধীনতা দিল ওরা, ফিলিস্তিনকে দিল না। প্রায় আধ শতাব্দী হয়ে এল, কোন সমাধান হলো না সমস্যার। ইসরাইলী সৈন্যের মার খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় ফিলিস্তিনীরা। স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করে ওরা, অথচ পশ্চিমারা তাকে বলে 'সন্ত্রাসী তৎপরতা'। 'ওরা আরব সন্ত্রাসী'। কী অদ্ভুত বিচার। আজ তাদেরই আদিভূমিতে ইসরায়েল তাদের 'সীমিত স্বায়ত্বশাসন' দেয়।

দারভিশ হামাম জানে, ভেতরে ভেতরে কিছু একটা চলছে। খুব সম্ভব 'স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল' নিয়েই স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠন করতে যাচ্ছেন ইয়াসির আরাফাত। 'স্বাধীনতা,' শব্দটা শুনলেই কেমন যেন লেগে ওঠে গায়ের মধ্যে। অদ্ভুত শিহরণ জাগে, ঠিক যেন...

লঘু পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল হামাম। জামাল শামলুকে দেখল তার দিকে এগিয়ে আসছে। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ ছেলেটা। হালকা-পাতলা, সুঠামদেহী। গভীর কালো চোখ। চোখের পাপড়ি মেয়েদের মত দীর্ঘ, ঢেউ হয়ে ওপরদিকে বেঁকে আছে। ক্লীন শেভড্ মসৃণ ত্বকের নিচে দাড়ি-গোঁফের নীলচে রেখা ফুটে আছে। সব মিলিয়ে চমৎকার দেখতে।

'বোসো,' কাছের চেয়ারটা দেখাল ওকে সার্জেন্ট।

'ধন্যবাদ।' বসল যুবক। আড়চোখে হামামের টাট্টু করা

লেখাটা দেখল। 'ওটা...কোত্থেকে করিয়েছেন, সার্জেন্ট, জানতে পারি?'

'বৈরুত থেকে। কেন, তুমি করাতে চাও?'

খানিক ইতস্তত করল যুবক। 'অপরাধ নেবেন না, ওখানে যা লেখা, তা আপনি মেনে চলেন?'

আপনমনে মাথা দোলাল সার্জেন্ট। 'যদ্দূর সম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করি, বয়। খুব চেষ্টা করি। কিন্তু,' মৃদু শ্রাগ করল। 'নিতান্তই সাধারণ এক মানুষ আমি, সবসময় তাই পেরে ওঠা সম্ভব হয় না। তবে চেষ্টার ক্রটি করি না আমি। সাধারণ মানুষের এরচেয়ে বেশি কিছু করার ক্ষমতা নেই।'

নিজের দু'হাতের কর্কশ তালু পরীক্ষা করল জামাল। মুখ না তুলে অনেকটা মন্তব্যের সুরে বলল, 'কাল আপনি ইচ্ছে করে আমাকে জিতিয়ে দিয়েছেন।'

'কি করে বুঝলে?' ঘুরে তাকাল সে।

'আমার মনে হয়েছে। সত্যি না?'

একটু ইতস্তত করল লোকটা। 'হ্যাঁ। তোমার মনের জোর বাড়াবার জন্যে কাজটা করতে হয়েছে আমাকে। তুমি অযোগ্য বা আর কিছু বলে নয়। তাছাড়া কাল তুমি এমনিতেও অনেক ভাল করেছ। আমি যদি জিততাম কাল, খুব বেশি হলে আধ ইঞ্চির ব্যবধানে জিততাম। ওই আধ ইঞ্চির চাইতে তোমার নিজের আকাশছোঁয়া আস্থা অর্জন করার প্রয়োজন বড় ছিল, জামাল।'

চেহারা কালো হয়ে গেল তার। 'তাই বলে...'

'কাম অন, বয়! এতে মন খারাপ করার মত কিছু নেই। অনেক সময় বাবা ছেলের জ্ঞানের বহরের কাছে হেরে আনন্দ পায়। অনেক শিক্ষকও একই মজা পায় শিষ্যের বিদ্যার কাছে হার স্বীকার করে। আমিও তেমনি পেয়েছি তোমার ব্যগ্রতার কাছে

হেরে।'

শ্রাগ করল সার্জেন্ট। 'মিথ্যে নয়, জামাল। কাল সত্যি আমার জিভ বের করে ছেড়েছ তুমি। অনেক কষ্ট হয়েছে তোমার নাগাল পেতে।'

'সত্যি?' সন্তুষ্টির, গর্বের নিষ্পাপ হাসি ফুটল যুবকের মুখে।

'সত্যি। কাল অতুলনীয় পারফর্মেন্স দেখিয়েছ তুমি। আমি রেগুলার, স্পেশাল ফোর্স, তোমার বয়সের চেয়েও বোধহয় বেশি অভিজ্ঞতা আমার এ লাইনে। আর তোমার মাত্র তিন মাসের, সময়ের তুলনায় এ অনেক-অনেক বেশি।'

'আমার তো আজ এমনিতেই ছুটি,' একটু পর বলল জামাল। 'তারপরও কেন ছুটির কথা বলা হলো?'

'ঠিক বলতে পারছি না। কেউ একজন আজ ক্যাম্পে আসবেন শুনেছি। গুরুত্বপূর্ণ কেউ। মনে হয়...' থেমে গেল সার্জেন্ট।

'কি?'

'মনে হয় কোন বিশেষ কাজ পড়েছে কোথাও। কোন মিশন...'

'মিশন?' উত্তেজিত হয়ে উঠল জামাল শামলু। রক্তে বান ডাকল। 'আমাকে মিশনে যেতে হবে?'

গভীর দৃষ্টিতে ওকে দেখল হামাম। মাথা ঝাঁকাল। 'হয়তো।'

'কে আসছেন?' রীতিমত কাঁপুনি উঠে গেল তার বুকে।

'জানি না। এলে বোঝা যাবে।' গম্ভীর হয়ে গেল হামাম। 'তবে খেয়াল রেখো, এ নিয়ে কারও সামনে কিছু বলবে না। একটা শব্দও না।'

'আচ্ছা।'

আসরের আযান শুনে উঠল ওরা। নামাজ পড়ে এসে আবার বসল। পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা হয়ে গেল চোখ।

বিরক্ত হয়ে উঠল দারভিশ হামাম। বুঝল, যে-জন্যেই হোক আজ আর আসছে না ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট বা তার গুরুত্বপূর্ণ অতিথি। উঠে পড়তে যাচ্ছিল, এই সময় দূরে বালির মেঘ দেখতে পেল।

ঝড়ের বেগে পাঁচ মিনিটের মাথায় ক্যাম্পের উঁচু তারকাঁটার ফেন্সের গেটে পৌঁছে দাঁড়াল একটা সুজুকি জীপ। ভলান্টিয়ার গার্ড গেট খুলে দিতে ব্যারাকের সামনে এসে থামল ওটা। তিনজন নামল ভেতর থেকে, লেফটেন্যান্ট আতাসী, ওমর এবং অন্য আরেকজন। দীর্ঘদেহী।

তার ঠাণ্ডা চাউনি দেখেই হামাম বুঝে ফেলল লোকটা ভয়ঙ্কর। যার দেখার চোখ আছে…কমান্ড্যান্টের ডাকে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল তার।

'সার্জেন্ট, ইনি হচ্ছেন আমাদের সেই মেহমান। মেজর মাসুদ রানা।'

'মেজর' শুনেই শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গিয়েছিল হামামের, খটাশ করে কড়া স্যালুট ঝেড়ে দিল। দেখাদেখি জামালও তাই করল। প্রতিউত্তর করল রানা, হাত বাড়াল হ্যান্ডশেকের জন্যে। এইখানটায় সামান্য হোঁচট খেলো হামাম। মানুষটা এত সুন্দর করে হাসে কি করে? চেহারায় খুনীর ছাপ, অথচ হাসিতে শিশুর সরলতা, তা হয় কিভাবে?

ভেতরে বসল ওরা। বিশাল আড়াইশো কেভিএ জেনারেটর চালিত ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা সফট ড্রিঙ্ক বের করে পরিবেশন করল সার্জেন্ট।

জেরুজালেম।

প্রধানমন্ত্রীর অফিসে সেদিনের মত গুরুত্বপূর্ণ, রুদ্ধদ্বার সভা চলছে। অভিন্ন সভাসদ। তবে সে রাতের উদ্দীপনা নেই মনে হলো

মানুষগুলোর মধ্যে।

'এই লোকের অ্যাকটিভিটিজ আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না,' বলে উঠল মোসাদ প্রধান ইয়েহুদা বেন মেইর। 'তার ব্যাপারে যে সব তথ্য গত দু'দিনে পেয়েছি আমি, তা এক কথায় ডিসটার্বিং। ভেরি ডিসটার্বিং। যেনেক শেষ পর্যন্ত সফল হবে কি না, আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'আরে না!' দৃঢ়স্বরে তার সন্দেহ প্রত্যাখ্যান করল যাহাল চীফ, ইয়াদ এলিয়াহুদ। 'ওর কর্মকাণ্ড ডিসটার্বিং, স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে ওরকম আশঙ্কা ভুলেও মনে ঠাঁই দেবেন না, মিস্টার মেইর। ইয়েহোনাথান যে কী চীজ, সে আমি জানি। ওরকম দশটা মাসুদ রানাকে...'

'কিন্তু লোকটার ব্যাপারে আমার ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত রেকর্ড আছে, তা সত্যি বিস্ময়কর।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মেজর জেনারেল। 'জানি। কিন্তু অতীতে ওর প্যাঁচে পড়ে যেসব ক্ষেত্রে আমাদের হার মানতে হয়েছে, এবারের সাথে সেসবের অনেক তফাত আছে। অতীতে প্রতিবার আমাদের পিছু লাগার মত কিছু না কিছু সূত্র ছিল ওর হাতে, এবার নেই তা। সুতো ছাড়া দৌড়ঝাঁপ করে কী-ই বা এমন করতে পারবে মাসুদ রানা? হানানের সাথে মীটিঙই সার, আর এগোবার পথ নেই।

'ঝামেলা হলে ইমার্জেন্সি বীকন সিগন্যাল দেয়ার ব্যবস্থা ছিল বাংলার গৌরবের। সে খবর অবশ্য জানা ছিল না আমাদের। সে না হয় না-ই থাকল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা ঠেকিয়ে তো দিয়েছি আমরা! জাহাজ কোথায় সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওদের। আরেক ভয় ছিল কাপলওয়েট। ও আমাদের হয়ে কাজ করছে, সে খবর রানা যদি পেয়েও থাকে, সে আসলে যে কে, কোনদিনও

জানতে পারবে না। জানার একটা উপায় ওদের ছিল, তার সলিসিটরের মাধ্যমে। কিন্তু সে পথও আগেই মেরে রেখেছে কাপলওয়েট। হানান ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও সলিসিটরের দেখা পায়নি প্রথমে। পরে যা-ও বা পেয়েছে, মক্কেলদের ভুয়া এক তালিকা দেখিয়ে তাকে বোকা বানিয়েছে সে।

'আর কি বাকি থাকে তাহলে? সশরীরে হাজির হয়ে জাহাজ খুঁজে বের করার চেষ্টায় লাগা। তা করতে মাসুদ রানাকে ওমান যেতে হবে। সে পথও বন্ধ। ওমানী অ্যান্টি টেররিস্ট সংস্থার চীফ মেজর রোমান,' থেমে একটু হাসল লোকটা। 'ওকে দেখতে পারে না। তাকে জানানো আছে, ও গেলে এয়ারপোর্ট থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাছাড়া আল-ফাতাহ্ জাহাজ খোঁজার যে পদক্ষেপ নিয়েছিল, তাও বানচাল করে দিয়েছে সে। সোজা হাঁকিয়ে দিয়েছে ওদের।'

নড়ে বসল প্রধানমন্ত্রী। 'জানি। কিন্তু মাসুদ রানাকে দেখতে পারে না কেন?'

'ওদের মধ্যে পুরানো শত্রুতা আছে', মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার,' মোসাদ চীফ বলল এবার।

'কি নিয়ে সেটা?'

''৭৬ সালে ওমানের পাহাড়ী দফার উপজাতির সাথে সুলতানের বাহিনীর মধ্যে বড় ধরনের এক গৃহযুদ্ধ বেধেছিল,' নড়েচড়ে বসে শুরু করল মোসাদ প্রধান। 'এখন ওদের যে সংস্কৃতি মন্ত্রী, শেখ জাফর, সে ছিল দফার ট্রাইব চীফ। এখনও তাই আছে সে। ব্রিটেন সুলতানের পক্ষ নেয় সেই যুদ্ধে, আর বহুদিনের বন্ধু বলে রানা নেয় জাফরের পক্ষ। তার যোদ্ধাদের গেরিলা ট্রেনিং দিত রানা, বলা যায় ওর জন্যেই জিতে যায় সেবার দফার বাহিনী। তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া মেনে নিতে বাধ্য করে সুলতানকে। না

মেনে উপায় ছিল না সুলতানের, নইলে হয়তো গদিই হারাতে হত।

'এখন ওদেশের অ্যান্টি টেররিস্ট সংস্থার চীফ, এক্স মেজর হ্যারি রোমান, সে তখন ছিল ব্রিটিশ এসবিএসে। সুলতানের বাহিনীকে পরিচালনা করত। হেরে যাওয়ার সেই কষ্ট এখনও ভুলতে পারেনি রোমান।'

'আই সী!'

'এখনকার পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা,' এলিয়াহুদ বলে চলল। 'চাকরি ছেড়ে ওমানের নাগরিকত্ব নিয়েছে সে, প্রভাব খাটিয়ে ওরকম ক্ষমতাশালী এক সংস্থার মাথা বনে গেছে। ইচ্ছে করলে যে কাউকে এয়ারপোর্ট থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারে সে। সুলতানের কাছে রিপোর্ট করে লাভ হবে না, লোকটা হ্যারি রোমানের কথার বাইরে যাবে না। কাজেই...' শ্রাগ করে থেমে গেল সে।

মৃদু হাসি দেখা দিল বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মুখে। 'তাহলে তো ভালই হলো দেখছি। এত সাহায্য যখন পাচ্ছি, তখন আর চিন্তা কিসের?' যাহাল প্রধানের দিকে তাকাল। 'আমাদের মাদার শিপ জায়গামত পৌঁছুচ্ছে কবে নাগাদ?'

'আর তিন-চারদিনের মধ্যে, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার। শিপিং লেন থেকে বহু ঘুরে যেতে হচ্ছে বলে সময় একটু বেশি লাগছে। আমার ধারণা ও নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

'কিন্তু...'

'কি?' দ্বিধাগ্রস্ত মোসাদ চীফকে দেখল প্রধানমন্ত্রী।

'আমি ভাবছি মাসুদ রানা এ মুহূর্তে কোথায়। হঠাৎ করে লন্ডন থেকে উধাও হয়ে গেল কেন?'

'দেখুন গিয়ে কোন ক্লু না পেয়ে ফিরে গেছে হয়তো দেশে,

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ফুটল এলিয়াহুদের চর্বি বোঝাই চেহারায়। 'আর যাবে কোথায়?'

'তাহলে আল-ফাতাহ্‌র ওরা ওখানে কি করছে শুধু শুধু?' অনেকটা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল বেন মেইর।

'মাতম করছে হয়তো,' প্রধানমন্ত্রীর এক পরামর্শদাতা বলে উঠল। 'অথবা নতুন করে কোত্থেকে অস্ত্র কেনা যায় ভাবছে। পয়সাওয়ালা, দুম্বাখোর আরব গৌরী সেন বন্ধুর তো অভাব নেই আরাফাতের।'

'ভালই তো, ওরা কষ্ট করে অস্ত্র জোগাড় করবে, আমরা তা দিয়ে আমাদের গুদাম ভরতে থাকব, ক্ষতি কি? ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে ওরাও কাউকে কিছু বলতে পারবে না। আর আমরাও...' থেমে শ্রাগ করল নেতানিয়াহু।

প্রধানমন্ত্রীর রসিকতায় ভুঁড়ি দুলিয়ে হেসে উঠল এলিয়াহুদ। দেখাদেখি অন্যরাও, বেন মেইর বাদে। কেন যেন হাসি এল না তার। ভাবছে কিছু একটা। বৈঠকে আসার আগে ভেবেছিল বাংলার গৌরবকে আর কোথাও সরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব তুলবে, কিন্তু এলিয়াহুদ প্রথমেই যেভাবে হেসে উড়িয়ে দিল তার আশঙ্কা, তাতে মুখ খুলতে ভরসা হচ্ছে না।

তাছাড়া মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীও তার পয়েন্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি। করলে নিশ্চয়ই এক-আধটা প্রশ্ন করতেন, কেন তার আশঙ্কা, জানতে চাইতেন। তা যখন করেননি, তখন কথা না বাড়ানোই ভাল। তাছাড়া জাহাজ সরাতে গেলে বিপদ ঘটে যেতে পারে। খোঁজ নিয়ে হয়তো দেখা গেল বাংলাদেশী স্পাইটা সত্যিই দেশে ফিরে গেছে, অথচ এদিকে তার কথামত অনর্থক জাহাজ টানাটানি করতে গিয়ে কারও চোখে পড়ে গেছে ওটা, সব দোষ তখন তার ঘাড়েই চাপবে। কি দরকার শুধু শুধু

ঝামেলা টেনে আনার?

বৈঠক শেষ হতে অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি নিয়ে উঠল ইয়াহুদ বেন মেইর। গাড়িতে বসে মনে হলো কোথাও যেন কি এক ষড়যন্ত্র চলছে। খুব গভীর কোন ষড়যন্ত্র। সেটা কি, যদি জানা যেত!

করাচি। হোটেল হিলটন।

নিজের সুইটের ড্রইংরুমে বসে আছে মাসুদ রানা। জরুরী কিছু কেনাকাটার কাজে গত রাতে এখানে পৌঁছেছে। যা যা চাই, এখানেই সবচেয়ে সহজলভ্য সেসব। কাজ শেষ। অল্প সময়ের মধ্যে রওনা হয়ে যাবে ওমানের পথে। এ মুহূর্তে চিন্তিত। মেজর হ্যারি রোমানের কথা ভাবছে।

লোকটা ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না, রানা খুব ভাল করেই জানে। অথচ এক সময় ঘনিষ্ঠ না হলেও দুজনের মোটামুটি একটা সম্পর্ক ছিল। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ মিশনে তাকে নিয়ে কাজও করেছে রানা। কিন্তু ওমানের গৃহযুদ্ধে যেই সুলতান হেরে গেল, ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত হার হিসেবে নিল লোকটা, খেপে গেল ওর ওপর। সেই ঘটনার পর বহুদিন ওর পিছনে লেগে ছিল ব্যাটা, নানাভাবে হেনস্তা করতে চেয়েছে। ফ্যাসাদে ফেলে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছে, তাতে যদিও লাভ হয়নি। কিন্তু তবু পিছু ছাড়েনি রোমান।

এইবার একটা চমৎকার সুযোগ পাবে সে ওকে এক হাত নেয়ার। ওকে মাসকাটে দেখলে ব্যাটা কিভাবে রিঅ্যাক্ট করবে? ভাবতে গিয়ে হাসি পেল রানার। নিশ্চয়ই রাগের চোটে...।

জানালার পর্দা সরিয়ে আনমনে নিচের ব্যস্ততা দেখল ও কিছুক্ষণ। বেশ কিছুদিন পর আসা, তাই সব নতুন নতুন লাগছে।

আগের থেকে আরও সুন্দর হয়েছে করাচি, মানুষও বেড়েছে প্রচুর। সবাই মহাব্যস্ত। কার, জীপ, বাস-মিনিবাস, ট্যাক্সি-বেবিট্যাক্সি মোটর সাইকেলে গিজগিজ করছে চওড়া রাজপথ। শেষেরটার মধ্যে ভেসপা প্রচুর। আর আছে ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ায় টানা টাঙা। সংখ্যায় কম অবশ্য। রাজপথে ঠুক্-ঠুক্ খুরের আওয়াজ তুলে দুলকি চালে ছুটছে ঘোড়া। মুখ তুলে দূরে তাকাল রানা, ক্লিফটন বীচের ওপাশের সাগরের দিকে। ধোঁয়া ধোঁয়া দৃশ্য, প্রকাণ্ড এক গ্লাস শীটের মত বিছিয়ে আছে আরব সাগর। নিস্তরঙ্গ, নিথর। দশটায় নিচের লবিতে নেমে এল ও, ফোন করতে হবে পুরানো এক বন্ধু, শেখ আজিজ বিন সাউদ বিন নাসির আল জাফরকে। ওমানের সংস্কৃতি মন্ত্রী ভদ্রলোক। হোটেল থেকেও করা যেত ফোন, কিন্তু কাউকে ওদের ফোনালাপ ট্যাপ করতে দিতে রাজি নয় রানা।

পিছনে কেউ আছে বলে মনে হয় না। লাগতে যাতে না পারে, সে জন্যে লন্ডন ছাড়ার সময় হাজার গুণ সতর্ক ছিল ও। তবু, সাবধানের মার নেই। রিসেপশন ডেস্ক থেকে একগাদা ফোন কার্ড কিনে লবির শেষ মাথার এক বক্সে এসে ঢুকল রানা। লাইন পেতে কোন সমস্যা হলো না, হলো মন্ত্রীকে পেতে। একের পর এক ওমানী অফিসারের ডেস্কে ঘুরে বেড়াতে লাগল কানেকশন, সবাই জানতে চায় মন্ত্রীকে ওর কি দরকার। জবাবে সন্তুষ্ট হতে না পেরে কেউ বলল মন্ত্রী ব্যস্ত, এখন লাইন দেয়া সম্ভব নয়, কেউ বলল কনফারেন্সে আছেন, অথবা ছুটিতে। মহাবিরক্ত হয়ে উঠল রানা।

এমন সময় খুব সম্ভব দুর্ঘটনাবশতই স্বয়ং শেখ জাফর ফোন তুললেন হঠাৎ করে। অনেকদিন পর তাঁর পরিচিত গলা শুনতে পেয়ে নীরবে হাসল ও।

'ইওর এক্সেলেন্সি?'

'হোয়াট, শুনতে পাচ্ছি না!'

চেঁচাল ও। 'ইওর এক্সেলেন্সি! আমি মাসুদ রানা!'

'আজিজ জাফর হিয়ার। ডু স্পীক আপ্!'

'মাসুদ রানা বলছি আমি।'

'হোয়া…কে!' বৃদ্ধের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চেহারা, বিস্ময়, দিব্যচোখে দেখতে পেল ও। 'কি বললেন? মাসুদ রানা!'

'ইয়েস, ইওর এক্সেলেন্সি।'

'কী আশ্চর্য!' গলা খাদে নেমে গেল মন্ত্রীর। 'কী আশ্চর্য! বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। কোথেকে, মাই বয়?'

'আগে কাজের কথা বলে নিই, ইওর এক্সেলেন্সি। তারপর…'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর!'

প্রায় দশ মিনিট ধরে একনাগাড়ে বলে গেল ও, শুনতে শুনতে অন্য প্রান্তে চোখ কপালে উঠল ট্রাইব চীফের। একটাই প্রশ্ন করলেন, 'এতসব কিসের জন্যে, রানা?'

'ওরা গিয়ে কিছু কিছু বলবে আপনাকে, ইওর এক্সেলেন্সি। বাকিটা আমি এসে বলব।'

'ওকে, রানা,' একটু চিন্তা করে বললেন তিনি। 'এনওসি কোন সমস্যা হবে না। ওরা কোন ফ্লাইটে আসছে বলো, কাগজপত্রসহ আমার ড্রাইভার এয়ারপোর্টে থাকবে। তোমারগুলোও জায়গামত থাকবে। ইন্সপেক্টর কারেমির কাছে। আমার ট্রাইবের মানুষ।'

'অনেক ধন্যবাদ, ইওর এক্সেলেন্সি।'

মন্ত্রীর সাথে কথা সেরে আরও দুই পুরানো বন্ধুকে ফোন করল রানা। একটা ওদেশের রয়্যাল এয়ার ফোর্স ব্যারাকে, অন্যটা মাসকাটের সমুদ্র বন্দর মিনা কাবূজে। আরও একটা ফোন করল রানা। ঢাকায়।

দুপুরের একটু আগে বন্দরে এল ও। অঘাটে ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি এক স্পীড বোটে উঠে পড়ল। তীর থেকে বিশমাইল দূরে অপেক্ষমাণ মোটামুটি বড় এক ট্রলারে ওকে পৌঁছে দিল সেটা। নাগমা ওটার নাম। লে. আতাসী হাত ধরে টেনে তুলল। 'সব ওকে, বস্?'

'ওকে,' বলল রানা। 'এদিকের?'

হেসে বুড়ো আঙুল দেখাল বেদুইন। 'ওরা রওনা হয়ে গেছে?'

'এতক্ষণে অর্ধেক পথ পেরিয়েও গেছে,' ঘড়ি দেখে বলল ও।

হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল ট্রলারের শক্তিধর টুইন ইয়ানমার মেরিন ডিজেল এঞ্জিন, বো উঁচু করে তুমুল গতিতে আরও গভীরের দিকে চলল। জায়গামত পৌঁছে পুব-দক্ষিণ দিকে মুখ করে লম্বা দৌড় লাগাল নাগমা।

ছয়

সময় হয়েছে, ভাবছে ফার্স্ট অফিসার ফখরুল হাসান। আজই পালাতে হবে তাকে যেভাবে হোক।

বাংলার গৌরবের অন্ধকার স্টোররূমে বসে আছে সে। ইমার্জেন্সি সার্চিং বীকন সিগন্যাল পাঠাবার ব্যর্থ চেষ্টার পর তাকে এখানে আটকে রেখেছে ইসরাইলী কমান্ডোরা। আর কোন ঝুঁকি

নেয়ার ইচ্ছে নেই ওদের।

ভেতরে বাইরের আলো আসার একমাত্র পথ বাল্কহেডের গায়ের ছোট্ট, আড়াআড়ি এক স্কাট্‌ল্ বা পোর্টহোল। বেশ ওপরে। ওটার দিকে তাকাল হাসান। মাথার ওপরের ডেক প্লেটে ভারী একজোড়া বুটের আওয়াজ উঠল। গার্ড। গত ক'দিনের রুটিন যদি না বদলে থাকে, তাহলে দু'ঘণ্টা পর আবার শোনা যাবে শব্দটা। এদিকটায় নজর বোলাতে আসবে ওদের কেউ একজন।

হাসানকে যে কুঠুরিতে বন্দী করে রাখা হয়েছে, সেটা আফটার সুপারস্ট্রাকচারের ভিতের কাছে। সিঁড়ির নিচে। ভেতরটা ফাঁকা, তাকে ঢোকানোর আগে সব বের করে ফেলা হয়েছে। বিশেষ করে তার পালানোর ব্যাপারে সাহায্যে লাগে, এমন ছোটখাট কিছুই নেই। কয়েক ভাঁজ করা পুরু ক্যানভাসের বিছানায় ঘুমায় হাসান। দুটো জং ধরা বড় পেইন্টের টিনের ওপর একটা প্ল্যাঙ্ক বিছানো ডাইনিঙ টেবিলে খায়। দিনে দু'বার খেতে দেয়া হয়। সকালে ও রাতে।

সকালে টোস্ট বা সিয়েরিয়েলের সাথে কফি, রাতে সাধারণ ডিশ। তাও বেশি নয়, বরং প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। তাতে শাপে বর হয়েছে ফখরুল হাসানের। খুব দ্রুত ওজন হারিয়েছে সে, বেশ শুকিয়ে গেছে দেহ। চারদিন আগে ব্যাপারটা খেয়াল হতেই পালাবার উদগ্র ইচ্ছে পেয়ে বসেছে তাকে। অপর্যাপ্ত খাবার থেকেও বেশ কিছু করে বাঁচিয়েছে সে পরের ক'দিন, খায়নি। বিশেষ করে মাছ বা পোলট্রি খেয়েছে একেবারেই অল্প। যা একটু খেয়েছে ভেজিটেবল্।

উচ্ছিষ্ট ফিরিয়ে দেয়নি সে গার্ড কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে ভেবে। সাগরেও ফেলেনি, তাহলে ওসবের লোভে ইনলেটে মাছের আনাগোনা বাড়বে, তার পিছনে আসবে হাঙর। তাই বিছানার

তলায় গুঁজে রেখেছে হাসান। অসহ্য গরমে পচে গলে বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে ওসব, মাছির ভ্যানভ্যানানি অসহ্য হয়ে উঠেছে। একটা সেকেন্ড সুস্থির হয়ে বসে থাকার উপায় নেই।

চোখ নামিয়ে পাঁজর বের হওয়া হাড্ডিসার দেহের দিকে তাকাল সে। নেভিতে থাকার সময়কার অভ্যেস আজও আছে তার। নিয়মিত ব্যায়াম করে। সে জন্যেই ভুঁড়ি গজাবার সুযোগ পায়নি। ও জিনিস থাকলে মহাসমস্যা হয়ে যেত। অনেক শুকিয়েছে সে, ভাবল সন্তুষ্ট হয়ে। আশা করা যায় স্কাট্‌ল্ বড় রকমের কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না।

উঠে পড়ল ফার্স্ট অফিসার। পরনে শুধু জাঙিয়া, আর সব মেঝেতে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। ওগুলোর প্রয়োজন নেই আপাতত, থাকুক পড়ে। রঙের টিন একটার ওপর আরেকটা রেখে দাঁড়াবার জায়গা করল সে পোর্টহোলের সরাসরি নিচে। ওর ওপর উঠলে জাহাজের খোল মজবুত রাখার আড়াআড়ি যে সব লোহার স্পার আছে, তার একটায় পা কোনমতে রেখে উঁচু হওয়া যায়, নাগাল পাওয়া যায় পোর্টহোলের। ওটার গ্লাস প্রোটেকশনের অবস্থা যাচ্ছেতাই। এত পুরু হয়ে ময়লা জমে আছে কাঁচে যে বাইরে কিচ্ছু দেখার উপায়ই নেই। অ্যালুমিনিয়াম রিম জং পড়ে বরবাদ। তৈরির পর ওটা কোনদিন খোলা হয়েছে বলে মনে হয় না।

এখনও হত না যদি কমান্ডোরা তাকে এখানে আটকে না রাখত। পুরো একটা দিন পরিশ্রম করতে হয়েছে ওটা খুলতে। ডাইনিং টেবিল হিসেবে ব্যবহৃত তক্তার প্রান্ত দিয়ে সাবধানে পিটিয়ে পিটিয়ে জং ধরা স্ক্রু ভেঙে ফেলেছে হাসান। রিমটাও গেছে। তবে রক্ষা যে খসে পড়েনি সবসুদ্ধ, এখনও লটকে আছে কোনমতে।

স্পারে পায়ের আঙুলের ভর রেখে দাঁড়াল সে, আস্তে আস্তে

টেনে খুলে ফেলল গ্লাস প্রোটেকশন, ঠেলে দেয়ালের সাথে ঠেকিয়ে পথ পরিষ্কার করল। সাবধানে ছোট্ট ফোকর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল। বাইরের আলো ফুরিয়ে গেছে, জেঁকে বসতে শুরু করেছে আঁধার। কাজেই ভয়ের কিছু নেই। বাঁয়ে তাকাল সে, স্টার্নের দিকে। তারপর ডানে, কার্গো ডেকের ওমাথার বো-র দিকে।

ওখানে কোথাও সেন্ট্রি পোস্ট আছে, জানে সে। কিন্তু অন্ধকারে দেখতে পেল না কোথায়। অ্যাকুয়ামেরিন রঙ ধরেছে সাঁঝের আকাশ, কিছু কিছু তারা উঠেছে, মিট্ মিট্ করছে। ভীষণরকম স্থির বাতাস, পরিবেশ নিস্তব্ধ। অনেক নিচ থেকে খোলের গায়ে পানির মৃদু চাপড়ের দূরাগত আওয়াজ কানে আসছে শুধু।

জাহাজটাকে সবার চোখের আড়াল করার জন্যে কমান্ডোরা যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে, এ ক'দিন বাথরুমে আসা-যাওয়ার পথে তার সবই দেখেছে হাসান। চারদিকে বেশ কয়েকটা কর্ক বয়া ভাসিয়েছে ওরা, তার সাথে ঝুলিয়েছে প্রায় অদৃশ্য মনোফিলামেন্ট নেট। এত সূক্ষ্ম যে রাতে দেখাই যায় না। ওই দিয়ে জাহাজ ঘিরে রাখা হয়েছে যাতে কোন অবাঞ্ছিত ডুবুরী এলে আটকা পড়ে, কর্কের ফাৎনার মত দুলুনি দেখে টের পায় গার্ডরা। নিজেদের ফ্রগম্যান আছে, তেমন কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পানিতে নেমে পড়বে তারা।

প্রায় পুরো জাহাজ ঢেকে ফেলা হয়েছে ক্যামোফ্লেজ ড্রেপ দিয়ে, তার আড়ালে সারফেস হামলাকারী ঠেকাতে বসানো হয়েছে কয়েকটা মেশিনগান পোস্ট। এছাড়াও দুটো ইনফ্লেটেবল্ তো রয়েইছে প্রয়োজনে শত্রুকে তাড়া করার জন্যে। অবশ্য পানির তলার শত্রু ঠেকাতে কোন বেগ পেতে হবে না এদের। ব্যাপার টের পাওয়া গেলেই হলো, দু'চারটে হ্যান্ড গ্রেনেড পানিতে ফাটিয়ে

দিলেই কাজ শেষ। মরা মাছ খেতে মুহূর্তে গণ্ডা গণ্ডা হাঙর হাজির হবে ইনলেটে। ওরাই ব্যবস্থা করবে তাদের। এতসব বাধা ডিঙিয়ে পালানো কঠিন, সন্দেহ নেই। প্রায় অসম্ভব। তবু যে করেই হোক, অসম্ভবকে সম্ভব করতেই হবে আজ তাকে।

নেমে এল ফখরুল হাসান। পোর্টহোলটা বেশ ছোট, মাথা ঢোকানোর পর খুব সামান্য জায়গাই থাকে। ওখান দিয়ে বের হওয়া কঠিন হবে খুব। কাজেই অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। রুমের এক কোণে রাখা একটা জং ধরা অ্যাঙ্কর গ্রীজের টিন খুলল সে, সারা গায়ে ইচ্ছেমত মেখে নিল দুর্গন্ধযুক্ত, চটচটে জিনিসটা। নিজেকে এখন কেমন দেখাচ্ছে ভেবে হাসি পেল। এখন যদি মিমি ওকে দেখত, নিশ্চয়ই হেসে খুন হয়ে যেত।

না বোধহয়, পরমহূর্তে গম্ভীর হয়ে ভাবল, হাসার প্রশ্নই আসত না ওর। বরং যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড করতে যাচ্ছে হাসান, তার কথা ভেবে ভয়ে, আতঙ্কে···। ভাবনা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। মাথা গলিয়ে দিল ফাঁক দিয়ে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। তাপমাত্রা কিছু কমেছে, তবে হাসান তা টের পাচ্ছে না গ্রীজের প্রলেপের জন্যে। বরং ঘামছে সে, ঘামের সাথে গলে গলে পড়ছে জিনিসটা।

বাইরের খোলা বাতাসে কয়েকবার গভীর করে দম নিল হাসান, রিমের কঠিন চাপ অগ্রাহ্য করে অনেক কষ্টে, অনেক সংগ্রাম করে মাথার পাশ দিয়ে একটা হাত বের করে দিল। কিন্তু আর চুল পরিমাণও এগোচ্ছে না শরীর, রিমের ফাঁদে এমনভাবে ফেঁসে গেছে হাসান যে দম নিতেও কষ্ট হচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে, চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

মরিয়া হয়ে মোড়ামুড়ি শুরু করল জালের ফাঁসে আটকে পড়া মাছের মত। কিন্তু কাজ হচ্ছে না, বরং আরও দৃঢ় হয়ে এঁটে বসছে

রিম। দম নেয়ার জন্যে একটু থামল সে, তারপর আবার লেগে পড়ল মরণপণ সংগ্রামে। অসহ্য চাপে চোখে আঁধার দেখছে। যে অবস্থা, এখন আর পিছিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। মহাআতঙ্কে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়ল সে। অন্য হাতটা এরই মধ্যে কখন, কি করে যে বের করল, নিজেও টের পেল না।

ঠিক তখনই লকারের বন্ধ দরজার ওপাশে ভারী একজোড়া বুটের শব্দ শুনে জমে পাথর হয়ে গেল সে। বুকের খাঁচায় পাগলা ঘোড়ার মত উন্মত্ত লাফঝাঁপ শুরু করে দিল হৃৎপিণ্ড। মুখ-গলা শুকিয়ে খসখসে হয়ে উঠল। সর্বনাশ! হঠাৎ চক্করের সময় বদলাল কেন আজ হারামজাদারা? এই অবস্থায় যদি দরজা খুলে উঁকি দেয়...ভাবনাটা মাথায় আসতেই স্রেফ উন্মাদ হয়ে উঠল ফখরুল হাসান, অসুরের শক্তি ভর করল তার ওপর। জাহাজের খোলে দুহাতের চাপ দিয়ে মহা বিক্রমে নিজেকে ঠেলতে শুরু করল। প্রথমে কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। থমকে থাকল যেন মহাকালের ঘড়ি। ইনলেট, জাহাজ, বুটের শব্দ, সব অর্থহীন মনে হলো। তারপর, আচমকা দু'ইঞ্চিমত এগোল দেহটা।

রিমের সাথে ঠিকমত সংযোগ ঘটেছে গ্রীজের। নতুন উদ্যমে নিজেকে ফের ঠেলে দিল সে, আরেকটু এগোল। তারপর আরেকটু।

ওপরে বুটের শব্দ সরে যাচ্ছে টের পেয়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকল হাসান, সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাল হাজারবার। কোমর বের করতে সামান্য কষ্ট হলো, তারপর, চোখের পলকে বেরিয়ে এল পুরো দেহ। রিম ধরে কিছুক্ষণ ঝুলে থাকল, নজর সরাসরি নিচের আউটার কম্প্যানিয়নওয়েের ওপর। কোন নড়াচড়া নেই ওখানে।

নিশ্চিত হয়ে ঝুপ্ করে লাফিয়ে পড়ল হাসান, পা খালি বলে

কোন শব্দ হলো না। ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকল অন্ধকারে। চোখ কুঁচকে আঁধার ফুঁড়ে দেখার চেষ্টা করছে। ইনলেটের পানি কুচকুচে কালো, মাঝেমধ্যে এক আধটা বুদ্বুদ উঠছে। ছোট ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ছে মনোফিলামেন্ট নেট ধরে থাকা কর্ক বয়ার ওপর। তারার আলো সামান্য বেড়েছে এরমধ্যে, আকাশের পটভূতিতে চারদিকের ক্লিফের আকৃতি মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। বেশ কদিন পর নগ্ন শরীরে খোলা বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে মন খুশি হয়ে উঠল হাসানের। হোক না তপ্ত বাতাস।

ব্রিজের কাছ থেকে যথাসম্ভব সরে এসে বো-র দিকে এগোল সে পা টিপে। দেহের ওপরের অংশ ঝুঁকে আছে। অন্ধকারে তার ফরসা চামড়া কারও চোখে যাতে না পড়ে, সে ব্যাপারে পুরো সচেতন। ক্যামোফ্লেজ ড্রেপের মধ্যে দিয়ে চলা খুব কঠিন হলেও থামল না। বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলল।

আরেকটু হলে সর্বনাশ ঘটেই যাচ্ছিল, একদম যমের মুখে গিয়ে পড়তে যাচ্ছিল হাসান। বেঁচে গেল স্রেফ ভাগ্যের জোরে। কার্গো ডেকের কোথাও থেকে কেউ কেশে উঠতে চট্ করে থেমে দাঁড়াল। চাপা কাশি। বড়জোর দশ হাত সামনে আছে মানুষটা। গার্ড! দেহের সমস্ত রক্ত কয়েক মুহূর্ত জমে থাকল তার, কাশি না দিলে সোজা লোকটার ঘাড়ের ওপর গিয়েই পড়ত নিঃসন্দেহে।

কুঁকড়ে আরও ছোট হয়ে গেল সে, পিছিয়ে এল। বুকের ধড়ফড়ানি কমে আসতে ফের এগোল। কার্গো হোল্ডের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া স্টীলের ক্যাটওয়াক ধরে সরে এল জাহাজের আরেক মাথায়। প্রচুর সময় নষ্ট হলো। তারপর আবার ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে যাওয়া।

একবার পৌঁছতে পারলে হয় ওখানে। জায়গায় ধরে রাখার

জন্যে বয়া যে দড়ি দিয়ে বাঁধা, ওটা ধরে ঝুলে সোজা মনোফিলামেন্ট নেটের ওপাশে গিয়ে ইনলেটে নামবে, তারপর ডুব সাঁতার দিয়ে উল্টোদিকের তীরে উঠবে হাসান। অন্তত চার মাইল পথ, কম নয়। তবে সাঁতারে সে ভাল, অনেক পুরস্কার পেয়েছে সার্ভিসে, কাজেই ওটা তেমন সমস্যা হবে না।

ভোর হওয়ার আগেই ওপারে পৌঁছে যেতে পারবে সে, ভাল একটা জায়গা দেখে আত্মগোপন করবে। তারপর, কাল রাতে কাছের কোন জেলে পল্লীতে গিয়ে ওঠার চেষ্টা করবে সাঁতার কেটে। খাবার, পানি, পরিধেয়, জুতো, কিছুই নেই। ওসব ছাড়া পাথুরে জেবেলে একটা দিন কাটানো যে কতবড় অসম্ভব এক কাজ, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছে না হাসান। জানে, এতসব সমস্যা নিয়ে একসাথে ভাবতে বসলে সব এলোমেলো হয়ে যাবে। পিছিয়ে পড়বে সে। তারচেয়ে যখন যে সমস্যা আসবে, তখন তাই নিয়ে মাথা ঘামাবে।

আরেকটু গেলেই বো। অ্যাঙ্কর উইঞ্চ আর দড়িদড়ার স্তূপ টপকে এগোল সে। জায়গাটা খোলামেলা, তারওপর ব্রিজ থেকে দেখা যায়। কেউ যদি ওখানে থেকে থাকে, যদি একবার এদিকে তাকায়, ধরা পড়ে যাবে। তারার আলোয় পরিষ্কার দেখে ফেলবে খালি চোখেই। নাইট ভিউইং ডিভাইসের প্রয়োজন হবে না। তবে এ পরিস্থিতিতে দ্রুত নড়াচড়া করলে চোখে পড়ার চান্স যত বেশি, আস্তে করলে ততই কম। সেই ভরসায় বুক বেঁধে আছে হাসান।

পিঁপড়ের গতিতে অ্যাঙ্কর উইঞ্চ হাউজিঙের দিকে এগোল। সামান্য পথ, তাই অতিক্রম করতে ঝাড়া পাঁচটা মিনিট লাগল। স্টীল শেলে হেলান দিয়ে বসে বুক ভরে বাতাস টানল সে, স্বস্তির ঝিরঝিরে ধারা বইছে দেহমনে। হয়ে গেছে, আর সামান্যই বাকি। তারপর...

জমে গেল সে খুব কাছেই কাপড়ের খস্‌খস্‌ আওয়াজ উঠতে। উইঞ্চ হাউজিঙের ঠিক ওপাশে নড়ছে কেউ। মুহূর্তে ঘাম ছুটে গেল। নিশ্চই বেখেয়ালে কোন শব্দ করে ফেলেছিল, অথবা জোরে নিঃশ্বাস ফেলেছিল, সেই শব্দে তন্দ্রা কেটে গেছে কাছের সেন্ট্রির। দ্রুত ভাবছে কি করবে, আবার নড়ে উঠল সেন্ট্রি। কাশল 'খুক্‌' করে, হাই তুলল।

একটা কাঠামো দেখল হাসান খুব কাছেই, উঠে দাঁড়াচ্ছে। একবার এদিকে তাকালেই শেষ। কিন্তু এ পর্যায়ে তা সে হতে দিতে পারে না। ব্যাটা যেই হোক, তাকে সতর্ক হওয়ার সময় দেয়া যাবে না। বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল ফখরুল হাসান। চোখের কোণ দিয়ে ওকে দেখে সেন্ট্রিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, আঁতকে উঠল অস্ফুটে। ছয় হাত ব্যবধানে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। গার্ডের এম-১৬ কাঁধে ঝুলছে। চোখের ঘুম ঘুম ভাব পুরো কাটেনি।

হাসান সজাগ, সতর্ক, প্রস্তুত। সেই রিঅ্যাক্ট করল আগে, জোর পাবে বলে হাউজিঙে এক পা বাধিয়ে ঝাঁপ দিল লোকটার বুক সই করে। কাঁধ দিয়ে রকেটের গতিতে পড়ল বুকের ওপর। ব্যস্ত হয়ে কারবাইন তুলতে যাচ্ছিল কমান্ডো, 'ঘ্যাক!' করে উঠল, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল হাত-পা ছড়িয়ে। হাসান পড়ল তার ওপর। ডেক প্লেটে জোর আওয়াজ হলো দু'জনের আছড়ে পড়ায়, কারবাইন হাতছাড়া হয়ে গেল সেন্ট্রির। ওটাও কম শব্দ করল না।

কোনদিকে খেয়াল নেই ফার্স্ট অফিসারের, চিৎ হয়ে পড়া শত্রুর বুকে চেপে বসে দু'হাতে সাঁড়াশির মত গলা চেপে ধরেছে তার। দুই বুড়ো আঙুল গেঁথে বসে যাচ্ছে লোকটার ভয়েস পাইপের ওপর। চ্যাঁচাবার চেষ্টা করল কমান্ডো, চাপা গোঙানি বের হলো কেবল। গলায় চাপ আরেকটু বাড়তে উন্মত্তের মত হাঁটু

ছুঁড়ল সে হাসানের কুঁচকি সই করে। কাজ হলো, মুহূর্তের জন্যে একটু আলগা হলো সাঁড়াশি, এই সুযোগে দ্রুত নিজের আর শত্রুর মাঝে দুই হাত ভরে দিল সে চট্ করে। গলা ছাড়াবার জন্যে মরিয়া লাফ ঝাঁপ শুরু করল। মেঝেতে বুট ঠুকছে। গলা ছেড়ে দিল হাসান বাধ্য হয়ে। শব্দ থামাতে হবে এখনই।

ধীরেসুস্থে হাতের কিনারা সই করল সে। ধাঁই করে সর্বশক্তিতে মারল একই জায়গায়—গলায়। উইন্ডপাইপ চুরমার করে দিল আঘাতটা, মুহূর্তে নিভে গেল কমান্ডোর প্রাণপ্রদীপ। মাথা দড়াম করে বাড়ি খেলো ডেকে। দ্রুত তার বুক থেকে নেমে পড়ল হাসান, হাঁপাচ্ছে। কিন্তু বিশ্রামের সময় নেই, যে কোন সময় নতুন বিপদ এসে হাজির হবে। পানিতে কারবাইন কোন কাজে আসবে না বলে ওটার দিকে তাকাল না, বড় কমান্ডো ছুরিটা টান মেরে খুলে নিল লোকটার বেল্ট থেকে।

পিছনে কেউ কাউকে ডাকল চাপা গলায়। থেমে গেল হাসান, কমান্ডোর কালো পোশাক, বুট, খুলে নিয়ে যাবে ভেবেছিল, হলো না। দাঁতে ছুরি কামড়ে ধরে উবু হয়ে ছুটল রেলিঙের দিকে। আবার এল ডাক, কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ পেল তাতে। সে তখন পৌঁছে গেছে জায়গামত, বয়ার পাকানো রশি দুই হাতে আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়েছে, পুতুলের মত দোল খেতে খেতে ছুটে যাচ্ছে। হাতের চামড়া রেখে আসছে কর্কশ লাইনে, খেয়ালই নেই সেদিকে।

ওপর থেকে একটা বিস্ময় ধ্বনি ভেসে এল। পরক্ষণে একটা হাঁক এবং ধুপ্-ধাপ্ দৌড়ের শব্দ উঠল। লাশটা চোখে পড়েছে। আরও ঢিল দিল হাসান, নিচের কালিগোলা পানির ধেয়ে আসার গতি বেড়ে গেল। ওদিকে হাতের জ্বলুনি অসহ্য হয়ে উঠছে ক্রমেই। দেখতে দেখতে বয়ার ওপর পৌঁছে গেল সে। জানে

সারফেসের কয়েক ফুট নিচে আছে নেট, কাজেই নিশ্চিন্তে দড়ি ছেড়ে ভেসে পড়ল। নিজেকে ভাসিয়ে রেখে কয়েক ফুট এগোল, তারপর ডুব দিল। টের পেল, ওপরে কয়েকটা আলো জ্বলে উঠেছে।

বেশ কিছুটা দূরে সরে গেল হাসান, তারপর মাথা তুলল আস্তে করে। ঘুরে তাকাল। ডেকে অনেকগুলো ফ্ল্যাশ লাইটের লাফালাফি দেখা গেল, চিৎকার, অর্ডার আর কয়েক জোড়া পায়ের ছোটাছুটি আছে তার সাথে। পানিতে আলো ফেলে ব্যস্ত হয়ে ওকে খুঁজল কিছুক্ষণ কমান্ডোরা। তারপর হঠাৎ সব আলো নিভে গেল, নীরব হয়ে পড়ল বাংলার গৌরব।

এবার কি ঘটবে জানা আছে হাসানের, তাই সময় নষ্ট না করে যথাসম্ভব নিঃশব্দে সরে যেতে থাকল। যত দূরে সরে যাওয়া যায়, ততই ভাল। বিপদ দেখলে ডুব সাঁতার দিয়ে এগোবে। গত বছরও একনাগাড়ে তিন মিনিট পানির নিচে থাকতে পারত হাসান। অতটা হয়তো সম্ভব হবে না আজ, প্র্যাকটিস নেই, তবে দু'মিনিট নিশ্চই পারবে। সে ক্ষেত্রে দুটো ইনফ্লেটেব্‌লকে ফাঁকি দেয়া খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

জাহাজ থেকে বড়জোর একশো মিটার সরে গেছে সে, এমনসময় কানে এল দুটো আউটবোর্ড এঞ্জিনের গুঞ্জন। একটুপর আরও দুটো। ইয়া আল্লা! কতগুলো নিয়ে এসেছে ওরা? দুটো না ছিল?

চেঁচিয়ে কিছু অর্ডার করল কেউ, এবং একযোগে রাতকে দিন করে জ্বলে উঠল চারটে হেভি-ডিউটি নাইটসান সার্চলাইট। একটার আলো সরাসরি চোখে এসে পড়তে অন্ধ হয়ে গেল হাসান। আঁতকে উঠে ডুব দিল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে এক সেকেন্ড, দেখে ফেলেছে কমান্ডোরা। নাইটসান যখন জ্বালানো

হয়েছে, আর রেহাই নেই। বুঝে ফেলেছে হাসান। ওরা মরিয়া, দূর থেকে কেউ আলো দেখে ফেলতে পারে জেনেও আমল দিচ্ছে না।

ব্যাপারটা ঘটল একটু পর। শক্ ওয়েভ এবং স্থানচ্যুত পানির ধাক্কায় চর্কির মত কয়েকটা পাক্ খেলো হাসান, প্রচণ্ড চাপে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার অবস্থা। ব্যথায় কাৎরে উঠল সে, একগাদা বুদ্বুদ্ বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। গ্রেনেড ফেলছে ওরা! পরক্ষণে আবার একই কাণ্ড, তারপর আবার। নাইটসান ফ্লাডলাইট তার মাথার ওপর ফসফরেসেন্ট সিলিং তৈরি করেছে, নিচে প্রচুর আলো। হাসানের চারদিকে অজস্র রঙচঙে মাছ—কোনটা মৃত, কোনটা মরতে যাচ্ছে।

ভেসে উঠতে বাধ্য হলো ফখরুল হাসান। দম নিয়ে আবার ডুব দিতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল একটা বোট। চেঁচিয়ে উঠল কেউ, সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল সে। কিন্তু পালাবার কোন উপায় দেখল না। দিনের মত আলো হয়ে উঠেছে পানির তলায়, যত নিচেই নামুক, ওপর থেকে একদম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কমান্ডোরা।

পথ খুঁজছে হাসান মরিয়া হয়ে, এমন সময় চোখ পড়ল জিনিসটার ওপর। কলজে হিম হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

হাঙর!

কম করেও পঁচিশ ফুট লম্বা ওটা, আলোড়নের ফলে ভেসে ওঠা কাদা-মাটির মেঘের ভেতর থেকে তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে টর্পেডোর মত। আলোয় ঝকমক করছে ওটার গানমেটাল রঙের মসৃণ ত্বক। অন্য কোন গ্রহ থেকে আসা স্পেস ক্রুজারের মত লাগছে দেখতে। সাদা-কালো পাজামা স্ট্রাইপের ফুটখানেক লম্বা এক পাইলট মাছকে অনুসরণ করছে। দৈত্যাকার খুনীটাকে সোজা হাসানের দিকে টেনে নিয়ে আসছে আধমরা বেহুঁশ মাছটা।

সম্মোহিত হয়ে পড়ল সে হাঙরের টকটকে লাল চোখ দুটো দেখে। উন্মাদের চাউনি ওখানে। আরেকটা গ্রেনেড ফাটতে হাসানের সাথে ওটাও পাক্ খেলো, ব্যথায় পুরো উন্মাদ হয়ে উঠল. হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল কিসের ওপর প্রতিশোধ নেয়া যায়। হোমিং সোনারের পালসের মত ধক্ ধক্ করছে চোখ।

হঠাৎ হাসানের ওপর নজর পড়ল ওটার, পানিতে লেজের বিদ্যুৎগতির এক শক্তিশালী বাড়ি মেরে ছুটে এল তীরের বেগে। একটু দেরিতে হলেও আতঙ্কে স্থবির মস্তিষ্ক সাড়া দিল তার, কিন্তু কাজ হলো না। এসে পড়েছে দানবাকৃতি খুনী। বাঁ কাঁধে ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা অনুভব করল ফখরুল হাসান, নেমে যাচ্ছে নিচে।

শেষ মুহূর্তে প্রিয়তমা মিমির কথা মনে পড়ল, ছেলে সুহৃদের কথা মনে পড়ল। কিন্তু অনাগত মেয়ের নামটা যে কি রেখেছিল, কিছুতেই খেয়াল করতে পারল না।

দু'মাসের নয়, চিরকালের ছুটি হয়েছে তার।

জেরুজালেম। প্রধানমন্ত্রীর অফিস। মোসাদ প্রধানের জরুরী অনুরোধে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্যে তড়িঘড়ি বৈঠকে বসেছে যেনেক প্ল্যানিং কমিটি। দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন।

ফোল্ডার থেকে দুটো ছবি বের করল মোসাদ চীফ, এগিয়ে দিল যাহাল চীফের দিকে। 'বয়স্ক লোকের ছবিটা দেখুন আগে। দারভিশ হামাম ওর নাম।'

আধখানা চাঁদের ভেতর দিয়ে দেখল এলিয়াহুদ। চোখের কোণ কুঁচকে আছে। 'কে লোকটা?' বলল মিকি মাউসের গলায়।

'আল ফাতাহ্র স্পেশাল ফোর্সের সদস্য,' গম্ভীর গলায় বলল বেন মেইর। 'ওদের কমব্যাট সুইমার ইউনিটের কমান্ডার।'

প্রধানমন্ত্রী ঝুঁকে বসল। 'ব্যাপার কি?'

'এই লোক, এবং তার সঙ্গী,' দ্বিতীয় ছবিটা দেখাল সে। 'আজ সকালে মাসকাট গেছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমার অনুমান ওখানে কিছু একটা ঘোঁট পাকিয়ে উঠছে। নইলে এরা ওখানে কেন যাবে হঠাৎ!'

'ওরা মাত্র দু'জন,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল এলিয়াহুদ। 'মাত্র দু'জন। কি এমন করতে পারবে ওরা?'

মাথা দোলাল মোসাদ প্রধান। 'জানি না। তবে কিছু যে ঘটাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাসুদ রানার লন্ডন থেকে উধাও হয়ে যাওয়াটা প্রথম থেকেই সুবিধের মনে হয়নি আমার, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার। দেশে যদি ফিরেই যাবে সে, গোপনে যাওয়ার কি দরকার ছিল? সোজা পথেই তো যেতে পারত। আমার সন্দেহ লোকটা আদৌ দেশে যায়নি, এদিকেই কোথাও আছে। কলকাঠি নাড়ছে আড়াল থেকে।'

'আমার তা মনে হয় না, মিস্টার মেইর,' যাহাল চীফ বলল। 'নিশ্চয়ই...'

বাধা দিল প্রধানমন্ত্রী। 'এরা গেল কি করে ওদেশে? ওদের এনওসি কে স্পন্সর করল?'

'জানতে পারিনি,' মেইর মাথা দোলাল। 'ফোন করেছিলাম মেজর হ্যারি রোমানকে, শহরে নেই সে। মেসেজ দিয়ে রেখেছি, ফিরলেই পেয়ে যাবে।'

'এই ছবি কোত্থেকে পেয়েছেন?'

'আম্মান থেকে। এরা প্লেনে ওঠার সময় আমার লোক তুলেছে।'

থুতনি ঘষতে লাগল প্রধানমন্ত্রী। চিন্তায় পড়ে গেছে। 'কে ওদের এনওসি দিয়েছে জেনে আমাকে জানান। মেজর রোমানকে

ভালমত সতর্ক করে দিন ওদের ব্যাপারে।'

'নিশ্চয়ই!'

'আর আপনি, মিস্টার এলিয়াহুদ, যেনেক কমান্ডারকে সতর্ক করে দিন।'

এরপরও আধঘণ্টা চলল কমিটির বৈঠক।

মাসকাট। ওমান।

সংস্কৃতি মন্ত্রী শেখ আজিজ বিন সাউদ বিন নাসির আল জাফরের অফিস শহরতলিতে। জায়গার নাম রুয়াই। আধুনিক পাশ্চাত্য ও ঐতিহ্যবাহী আরবী আর্কিটেকচারের চমৎকার এক নমুনা তাঁর অফিস ভবন।

ঢুকতেই সুবিশাল লবি। রিসেপশন ডেস্ক নেই। এক ভারতীয় ক্লীনার মার্বেল পাথরের মেঝে পরিষ্কার করছে। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেই চমৎকার এক ফোয়ারা। ওটা ছাড়াতে তিনটে প্রশস্ত করিডর, একটা গেছে সোজা, অন্য দুটো ডানে-বাঁয়ে। প্রতিটার দুপাশে অনেকগুলো করে অফিস। আরবী অফিসাররা বসা ভেতরে, প্রত্যেকে কমবয়সী। বিশাল ডেস্ক সবার, কিন্তু টেলিফোন ছাড়া কিছু নেই ওপরে। ফাইলপত্র দূরে থাক, এক টুকরো কাগজও নেই।

মিনিস্ট্রির ড্রাইভার মাহমুদের পিছন পিছন চলেছে দারভিশ ও জামাল। অবাক চোখে বিলাসের ছড়াছড়ি দেখছে যুবক। সার্জেন্ট নির্বিকার। বেশ কিছু রুম পেরিয়ে একটায় ঢুকল ওরা। ভেতরে চমৎকার প্রেস করা সাদা শার্ট আর টাই পরা সুদর্শন এক পাকিস্তানী যুবক অভ্যর্থনা জানাল ওদের দুজনকে। বিদেশীরাই চাকা সচল রেখেছে এ দেশের। মন্ত্রী-সচিবরাই শুধু ওমানী, আর সব ব্রিটিশ, ভারতীয়, পাকিস্তানী।

পরিচয় পর্ব সেরে রুম সংলগ্ন বড় এক দরজা খুলে ঘোষণা করল যুবক, 'আপনার গেস্ট, ইওর এক্সেলেন্সি।'

ব্যস্ত হয়ে আসন ছাড়লেন আজিজ জাফর। ষাটের মত বয়স, কিন্তু এখনও দারভিশ হামামের মতই শক্তপোক্ত দেখতে। হেঁটে নয়, অনেকটা যেন নাচের ভঙ্গিতে দরজার কাছে পৌঁছে গেলেন তিনি। দারভিশ মনে মনে অবাক হলো ভদ্রলোকের গতি দেখে। পরিচয় পর্ব শেষ হতে তাদের নিয়ে ডেস্কের দিকে চললেন।

'এই বিল্ডিঙে একমাত্র আমার অফিসই এয়ার কন্ডিশন্ড নয়, সে জন্যে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি,' সুবাস মাখা দাড়ি নেড়ে বললেন জাফর। 'ওই জিনিস সহ্য হয় না আমার।' ইঙ্গিতে রুমের দুই কোণে চলন্ত দুই পেডেস্টাল ফ্যান দেখালেন। 'এতেই কাজ চলে আমার।'

'আমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না, ইওর এক্সেলেন্সি,' বলল দারভিশ। 'ফ্যানই যথেষ্ট।'

ওদের বসতে বলে মন্ত্রী বসলেন। 'আমি বেদুইন। জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে পাহাড়ে-মরুভূমিতে। বর্তমানে সে দিন নেই। তাঁবুর জায়গা দখল করেছে বিল্ডিং, ট্র্যাক চাপা পড়ে গেছে টারমাকের নিচে, আর গাড়ির যন্ত্রণায় উট তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। জানেন, উট এখন কত সমস্যার কারণ আমাদের? বেকার থাকে, গবাদী পশুর খাবার খেয়ে ওদের খাদ্যের অভাব ঘটায়। অথচ ওরা যখন মরুভূমিতে চলে বেড়াত, এ সমস্যা হত না।'

'অদ্ভুত ব্যাপার!' মন্তব্য করল সার্জেন্ট।

'অদ্ভুত? বলুন দুঃখজনক। সহকর্মী মন্ত্রীদের অনেকবার এ ব্যাপারে ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছি। কেউ কানে তোলে না। আরও আধুনিক হতে চায় সবাই। উপসাগরকে নিউ ইয়র্ক না বানানো পর্যন্ত যেন ওদের শান্তি নেই।' হাসলেন জাফর। 'যে

মানুষ তার আপন ঐতিহ্য ভুলে যায়, হাজারো বাঁধনে বাঁধা পড়ে যায় সে। কি বলেন? যাক্ সে কথা, এতদূর থেকে এক বুড়োর অর্থহীন প্রলাপ শুনতে আসেননি নিশ্চই আপনারা!'

বেয়ারার রেখে যাওয়া কফি ও এক প্লেট খেজুর দেখালেন। 'নিন্, শুরু করে দিন। তারপর শুনব সব।'

পাঁচ মিনিট পর জাফরই শুরু করলেন। 'তারপর? আমার ওল্ড ফ্রেন্ড মাসুদ রানা কেমন আছে?'

'ভাল আছেন, ইওর এক্সেলেন্সি,' শ্রদ্ধার সাথে বলল সার্জেন্ট।

'ও বলছিল কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, আর... কি যেন... গোপনীয়। তাই না?'

মাথা দোলাল সে।

'কিন্তু এত রাখঢাক কেন, বেআইনী কিছু নয় তো?'

আহত দৃষ্টিতে তাকাল দারভিশ। 'ইওর এক্সেলেন্সি, আমার বিশ্বাস আমার থেকে ভাল চেনেন আপনি তাঁকে।'

'ওহ্, ইয়েস! অফকোর্স! সরি, প্রশ্নটা আসলে মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে।' লজ্জা পাওয়া হাসি ফুটল মন্ত্রীর মুখে। 'ঘটনাটা কি, বলুন তো!'

'মিস্টার রানার দেশী একটা জাহাজ মাল নিয়ে আকাবা যাওয়ার পথে ওমানী সাগর থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

চোখ বিস্ফারিত, সতর্ক হয়ে উঠল তাঁর। 'কবে?'

'এক সপ্তা আগে, ইওর এক্সেলেন্সি।'

'নিখোঁজ মানে, ডুবে গেছে, না ডাকাতি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'ডুবে গেছে, এ কথা বিশ্বাস করেন না মিস্টার রানা। আমরা তাই এসেছি ওটাকে খুঁজে বের করতে।'

কি যেন ভাবলেন মন্ত্রী। 'কিন্তু এ কাজে আপনারা কেন?

বাংলাদেশ সরকার সরাসরি কেন যোগাযোগ করেনি আমাদের সাথে? ওটায় মাল কি ছিল বলুন তো, আর্মর্স?'

'ঠিক জানি না, ইওর এক্সেলেন্সি,' বিব্রত চেহারা হলো সার্জেন্টের।

'আমি বুঝেছি,' টেবিলে হালকা চাপড় মারলেন আজিজ জাফর। 'কোথায় যাচ্ছিল জাহাজ বললেন, আকাবা?'

'হ্যাঁ।'

'কাদের মাল হতে পারে?' নিচু কণ্ঠে নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি। 'মাসুদ রানা যদি আমার পরিচিত, ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হত, তাহলে ধরে নিতাম কাজটা বেআইনী কিছু। কিন্তু...' চোখ বুজলেন তিনি। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। ও আমার কাছে কি ধরনের সাহায্য আশা করে তাই বলুন।'

'ইওর এক্সেলেন্সি, রয়্যাল নেভি, এয়ারফোর্সে আপনার ট্রাইবের অনেক অফিসার আছেন। আপনি তাঁদের চীফ। উনি চান আপনি তাঁদের বলেন, নিয়মিত টহলের সময় ওই জাহাজের কোন খোঁজ বের করা যায় কি না, সে ব্যাপারে তারা যেন একটু খেয়াল রাখে। এবং সে কথা যেন গোপন রাখে। এইটুকুই।'

'হুঁম! আর?'

'আর কিছু নয়।'

'আপনারা কি করবেন?'

'আমরাও একই কাজ করব নিজেদের মত করে।'

আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মন্ত্রী। অবশেষে বললেন, 'মাসুদ রানা অতীতে আমার পুরো ট্রাইবের যে উপকার করেছে, তার বিনিময়ে এ কিছুই নয়। ঠিক আছে, আমি আজই কথাটা জানিয়ে দেব ওদের।'

চেপে রাখা দম নিঃশব্দে ছাড়ল সার্জেন্ট। 'ধন্যবাদ, ইওর

এক্সেলেন্সি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'তবে একটা কথা,' শাসানোর মত করে তর্জনী নাচালেন জাফর আজিজ। 'এ মিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুখ একদম বন্ধ রাখবেন আপনারা। আমাদের স্পাই নেটওয়ার্ক যেমন বড়, তেমনি এফিশিয়েন্ট। এসবের গন্ধও যদি পায় ওরা, ঘাড় ধরে দেশ থেকে বের করে দেবে আপনাদের। আমার তখন কিছুই করার উপায় থাকবে না, মনে রাখবেন। উল্টে আপনাদের এনওসি ইস্যু করার জন্যে বাজে পরিস্থিতিতে পড়ে যাব আমি।'

'অবশ্যই, ইওর এক্সেলেন্সি। ধন্যবাদ। আমরা আমাদের কাজ বুঝি।'

'গুড। মিনা কাবুজে কোন অসুবিধে দেখলে কাস্টমস সুপার কারেমির সঙ্গে দেখা করবেন। ওকে আপনাদের কথা বলে রাখব আমি।'

সাত

মিনা কাবুজ হারবার ফ্রন্টে ট্যাক্সি থেকে নামল দারভিশ ও জামাল। জেটিতে বাঁধা অসংখ্য মাছ ধরার ডাউর মধ্যে থেকে অনেক কষ্টে খুঁজে বের করল বোটটাকে। অন্যসব বোটের সাথে বেশ পার্থক্য আছে ওটার, স্যালভেজের কাজে ব্যবহার হয়। নাম গালফ পার্ল।

ডেকে বা হুইল হাউসে কাউকে দেখা গেল না। অসহ্য তাপে

ঝলসাচ্ছে বোটটা, অল্প অল্প দুলছে। জেটিতে বাঁধা লাইনে টান পড়ায় ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ উঠছে নিয়মিত বিরতি দিয়ে। উঠে পড়ল ওরা। ফোরডেকের উঁচু গানওয়েলে বেশ কয়েকটা ডাইভিঙ স্কুবা সেট দেখা গেল। পাশে বিছানো এক তোয়ালের ওপর ওগুলোর ডিম্যান্ড ভালভ্ খুলে রাখা আছে, সার্ভিসিঙের কাজ চলছে হয়তো।

বোধহয় বোটের দুলুনিতেই আফটার ডেকের কোথাও থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। পরনে শুধু কাটঅ্যাওয়ে ডেনিম শর্টস। পেশীবহুল, দীর্ঘদেহী মানুষ। সোনালী চুল রোদে পুড়ে প্রায় সাদা হয়ে গেছে। গায়ের রঙও বদলে গেছে, তবে চেহারার আদল দেখলে বোঝা যায় লোকটা ইউরোপীয়। পঁয়ত্রিশের মত বয়স। চোখের রঙ হালকা নীল। ওদের দেখল সে চোখ কুঁচকে।

'রিক ক্লেকে খুঁজছি আমি,' সার্জেন্ট বলল।

'কে আপনি?'

'দারভিশ হামাম। মেজর মাসুদ রানার মেসেঞ্জার।'

'আই সী!' হাসল লোকটা। 'ওর সাথে কথা হয়েছে আমার টেলিফোনে। আমিই রিক ক্লে। ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড।'

'এ আমার সঙ্গী, জামাল।' পকেট থেকে পুরু একটা খাম বের করল সার্জেন্ট। এগিয়ে দিল। 'মেজরের চিঠি।'

চেহারায় ব্যগ্রতা ফুটল লোকটার। এক টানে খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করল সে, ওখানে দাঁড়িয়েই পড়তে শুরু করতে যাচ্ছিল। ওদের কথা খেয়াল হতে বলল, 'চলুন, নিচে গিয়ে বসা যাক ঠাণ্ডায়।'

খাটো সিঁড়ি বেয়ে ফো'ক্যাসলে নেমে এল সবাই। দুই বাঙ্কের মাঝে পাতা এক পোর্টেবল টেবিলে দু'জনের লাঞ্চ সাজানো আছে দেখে দ্বিধায় পড়ে গেল দারভিশ। 'অসময়ে ডিসটার্ব করলাম

আপনাদের।'

'মোটেই না,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ক্লে। 'প্রচুর তাজা মাছ আর সালাদ আছে, আপনারাও বসে পড়ুন আমাদের সাথে।'

গ্যালি থেকে উঁকি দিল এক জাপানী। 'কে এসেছে?'

'গেস্ট, টোকিও। এসো আলাপ করিয়ে দিই।' দারভিশের দিকে ফিরে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হাসল ক্লে। 'ও আমার পার্টনার, টোকিও জো। আসল নাম নয় অবশ্য, আমার উচ্চারণ করতে সহজ হয় বলে রাখা। জাপানী নেভির এক্সপার্ট ডাইভার।'

লোকটা বেশ ছোটখাট। তেল চকচকে চেহারা। ক্লের তুলনায় একটু বেশি হবে বয়স। ওদের সাথে হাত মেলাল সে। পরিচয় পর্ব সেরে এক্সট্রা প্লেটের জন্যে ব্যস্ত পায়ে গ্যালিতে ফিরে গেল ক্ষমা চেয়ে। ওদের বসতে বলে ক্লেও বসল, চিঠি পড়তে শুরু করল। পাঁচ মিনিট পর মুখ তুলল সে। চিন্তিত। আনমনে বলল, 'ফোনে পরিষ্কার কিছু বলল না, তারপর এতসব...ব্যাপার কি?'

'মাফ করবেন,' ঝুঁকে বসল সার্জেন্ট। 'কিছু বলছিলেন?'

মাথা নাড়ল ক্লে। 'না, আপনাকে না।' চিঠি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল ওয়েস্টবিনে। 'আসুন, খেয়ে নিই আগে। তারপর কথা হবে।'

নীরবে খেলো সবাই। রিক ক্লেকে চিন্তিত দেখা গেল। থেকে থেকে তাকে দেখছে দারভিশ হামাম। মেজর মাসুদ রানার মুখে শুনেছে, এক সময় ব্রিটিশ স্পেশাল বোট সার্ভিসে ছিল এই লোক। ওস্তাদ ডাইভার। ওমান স্বাধীন হওয়ার পর সরকারের অনুরোধে এদের নৌ ডাইভারদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে থেকে গিয়েছিল। আর ফেরা হয়নি দেশে।

নিজে ছোট এক ডাইভিং কোম্পানি খুলেছে এখানে, বিভিন্ন তেল কোম্পানির হয়ে সাগরের তলায় তেলের মজুত খোঁজার কাজ

করে। বর্তমানে বেশ আর্থিক সমস্যায় আছে। কয়েক বছর আগে প্রচণ্ড ঝড়ে পড়ে সমস্ত ইকুইপমেন্টসহ ডুবে গেছে তার স্যালভিজ শিপ। দুর্ভাগ্য যে শিপটা নতুন কেনা ছিল, ইনশিওরেন্সের কাগজপত্র তৈরি করার আগেই ঘটে গেল বিপদ। পরে লোন করে এটা কিনেছে সে অকশনে। কোনমতে চলছে। আয় যা হয়, লোনের কিস্তি দিয়ে বিশেষ থাকে না।

'অনেক বছর হলো মাসুদ রানার সাথে দেখা নেই,' আপনমনে বলল ব্রিটিশ। 'কেমন আছে ও?'

প্রশ্নটা বেশ চিন্তায় ফেলে দিল দুই ফিলিস্তিনীকে। দেখা যদি না-ই হবে, মেজর রানা এ লোকের এত খবর জানে কি করে? সেদিন ক্যাম্পে যখন এসব নিয়ে কথা হলো, শুনে তো মনে হয়েছে বুঝি গত মাসের খবর বলছে সে ওদের। মানুষটার বন্ধুর অভাব নেই, ভাবল দারভিশ, প্রভাবও তেমনি। আজিজ জাফরের কথায়-কাজে পরিষ্কার বোঝা যায় তা। ওদের ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট তো মেজর রানা বলতে অজ্ঞান। কি আছে মানুষটার মধ্যে?

'ভাল আছেন,' বলল সে।

'ফোনে ওর সাথে কথা হয়েছে আমার, তবে ওপেন লাইন বলে তেমন কিছু বলেনি। আপনি বিস্তারিত জানাবেন বলেছে। ব্যাপারটা কি?'

'উনি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।'

'হ্যাঁ, পড়লাম চিঠিতে। রানা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। অতীতে ও অনেক ব্যাপারে সাহায্য করেছে আমাকে। বিনিময়ে ওর প্রয়োজনে আমারও তাই করা উচিত। এবং আমি করবও।'

'ধন্যবাদ।' বুকে হাত বেঁধে স্ফিংসের মত বসল সার্জেন্ট। টোকিও কফি নিয়ে এল। যোগ দিল আলোচনায়। পাঁচ মিনিটে ঘটনা খুলে বলল দারভিশ, আজিজ জাফরকে যা বলেছে, ঠিক

সেটুকু। এখানেও সেই একই প্রশ্ন উঠল, বাংলাদেশ কেন সরকারী পর্যায়ে যোগাযোগ করল না। জবাব দিতে অপারগতা প্রকাশ করল সে।

'রানা গোপনে কাজ করতে চাইছে?'

মাথা দোলাল দারভিশ।

'সার্চে কেউ বাধা দেবে আশঙ্কা করছে?' কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল রিক ক্লে।

'সম্ভাবনা আছে।'

খানিক ভাবল সে। 'জাহাজে কার্গো কি ছিল?'

'বলতে পারি না। মেজর জানেন।'

'আপনারা দু'জন...?'

'তাঁর সাথে কাজ করি।'

'আই সী!' পোর্টহোল দিয়ে পেনিনসুলার দিকে তাকাল রিক ক্লে। 'এ অঞ্চলে এমন ঘটনা আজকাল কম ঘটে। তবে ঘটে। যদি ওটাকে দুনিয়ার অন্য মাথায় না নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো খুঁজে বের করতে পারব।'

'মেজরের ধারণা এদিকেই আছে,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল সার্জেন্ট।

'তাহলে...' থেমে পড়ল ক্লে, চোখ কুঁচকে টোকিওর দিকে তাকাল। 'তুমি কি ভাবছ? কোত্থেকে শুরু করা যেতে পারে?'

'এ কাজে আমি অন্তত সার-কে বেছে নিতাম। কারণ ওদিকটা একেবারেই রিমোট। বিচ্ছিন্ন।'

'সেটা কোথায়?' ইঞ্চিখানেক ঝুঁকল সার্জেন্ট।

'ওমানের একদম পুব মাথায়। পথে অনেক জেলে পল্লী আছে, ওদের কাছে জিজ্ঞেস করলে হয়তো কোন খোঁজ পাওয়া যেতেও পারে।'

সন্ধের পর গালফ পার্ল থেকে নেমে এল ওরা। হোটেল থেকে ঘুরে আসবে এক চক্কর। ক্লেও নামল, খুব ভোরে পোর্ট ছাড়ার অনুমতি বের করতে হবে তাকে কাস্টমস থেকে। হোটেলের লবিতে দুই পুলিস দেখে সন্দেহ হলো কিছু দারভিশ হামামের, অস্বস্তি লেগে উঠল। ব্যাপারটা যে অমূলক ছিল না, একটু পরই তা বোঝা গেল।

ওপরে, ওদের রুমের দরজা খোলা দেখে থমকে দাঁড়াল দারভিশ, চাপা গলায় জামালকে বলল, 'আমার পিছনে থাকো।'

'কি!' উত্তেজিত হয়ে উঠল যুবক।

জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল সার্জেন্ট। হাত বাড়িয়ে খোলা দরজা পুরো মেলে দিল। সতর্ক হওয়ার বিশেষ দরকার আছে মনে হলো না তার, কারণ আলো জ্বলছে ভেতরে। কেউ বদ মতলবে এসে থাকলে ও কাজ করত না। মানুষটার সাথে চোখাচোখি হলো দারভিশ হামামের। দরজার দিকে মুখ করে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে সে আর্ম চেয়ারে। পরনে লাইটওয়েট কটন স্যুট। ব্যাকব্রাশ করা বাদামী চুল। লম্বা-চওড়া মানুষ, চৌকো চোয়াল। মিলিটারি মিলিটারি ভাবচক্কর। নিরাসক্ত চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

ভেতরে আরও দুই পুলিস দেখল সার্জেন্ট। ওদের সুটকেসের সব কিছু বের করে বিছানায় ছড়িয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে।

'আসুন, মিস্টার দারভিশ হামাম,' ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় বলল লোকটা। 'মিস্টার জামাল শামলু, আপনিও।' হাসল। 'আপনাদের অনুপস্থিতিতে কাজ শুরু করতে হলো বলে দুঃখিত।'

খাকী ড্রেস, পীকড্ ক্যাপ পরা দুই পুলিস কাজ থামিয়ে ঘুরে তাকাল, ওদের দেখে সোজা হলো। 'কি করছেন আপনারা?' কঠিন গলায় বলল দারভিশ।

উঠে পড়ল লোকটা। 'হয়েছে!' তীক্ষ্ণ গলায় বলে হাত নাড়ল পুলিসের উদ্দেশে। 'আপনারা যান এবার। নিচে অপেক্ষা করুন।'

ওরা বেরিয়ে যেতে একই গলায় প্রশ্ন করল সার্জেন্ট, 'কে আপনি?'

চাউনি কঠোর হয়ে উঠল লোকটার। 'ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করুন আগে। তারপর বলছি।'

রুখে দাঁড়াবে কিনা ভাবল সে। পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। দরজা বন্ধ হতে এক পা এগোল আগন্তুক। 'আমি মেজর হ্যারি রোমান। ওমান অ্যান্টি টেররিস্ট এজেন্সি চীফ।' হাত মেলানোর কোন আগ্রহ দেখাল না সে।

'হয়ে গেল? এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাদের?'

দারভিশের বিরক্তি মাখা চাউনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল মানুষটা। 'আপনাদের এনওসি প্রপার ওয়েতে ইস্যু হয়নি।'

'কি?'

'আপনাদের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, মিস্টার দারভিশ। নিয়ম অনুযায়ী ইস্যু হয়নি আপনাদেরগুলো। হয়েছে কারও প্রভাবে।'

'আপনি বলতে চাইছেন ওগুলো ইনভ্যালিড?' দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল সার্জেন্ট। জামাল সরে গিয়ে বিছানায় বসল, কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল মেজর রোমানের দিকে।

ঠাণ্ডা, বাদামী চোখে ওদের পর্যবেক্ষণ করল লোকটা। 'না। তবে এ দেশে বাইরে থেকে যে-ই আসুক, অবাঞ্ছিত ঝামেলা এড়ানোর জন্যে ভাল করে তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে দেখি আমরা। কিন্তু...'

বাধা দিল সার্জেন্ট। 'আমরা অবাঞ্ছিত বলতে চাইছেন?'

লোকটার প্রত্যেকটা প্রশ্নেই খোঁচা আছে খেয়াল হতে গম্ভীর হলো মেজর। কিছু একটা বলতে গিয়েও যে নিজেকে সামলে নিল, বুঝতে অসুবিধে হলো না। 'যখন কোন মন্ত্রী কারও নামে সরাসরি এনওসি ইস্যুর নির্দেশ দেন, তখন দ্রুত কাজ সারতে হয়, বলে তার রেকর্ড-কাগজপত্র ঠিকমত চেক্ করে দেখার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না।'

'আপনি নিশ্চই মনে করেন না আপনাদের কোন মন্ত্রী এমন কারও এনওসির জন্যে সুপারিশ করতে পারেন, যার এ দেশে অবাঞ্ছিত হওয়ার কোন কারণ আছে?'

আবারও সেই একই কাণ্ড ঘটল, কিছু বলতে গিয়ে চেপে গেল মেজর রোমান, বলল অন্য কথা। 'আপনার আচরণ ও মন্তব্য, আপত্তিকর, মিস্টার হামাম। ত্যাড়া কথায় বিশেষ সুবিধে হবে না।'

'দেখুন, মেজর, আমরা ক্লান্ত। বিশ্রাম দরকার আমাদের। বাঁকা কথা ছেড়ে আপনিই বা কেন সোজা প্রশ্ন করছেন না? প্লীজ, নতুন কি জানতে চান আপনি? আমার যা বলার, তা এয়ারপোর্টেই তো বলেছি।'

'হ্যাঁ, বলেছেন। বলেছেন, সিকিউরিটি অ্যাডভাইস দিতে এসেছেন আপনারা। আবার ফিনানশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের কথাও বলেছেন। দুই রকম কথা কেন বলেছেন?'

'কারণ দুটোই সত্যি।'

এক ভুরু উঁচু করল মেজর। 'অর্থাৎ? অ্যাসেট প্রোটেকশন বলতে...'

'অ্যাসেট প্রোটেকশন বলতে অনেক কিছুই বোঝায়, মেজর। তবে আমাদের আসল কাজ কম্পিউটর ফ্রড ঠেকাতে পরামর্শ দেয়া।'

'এদেশে কে আপনাদের সাহায্য চেয়েছে?' স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে

উঠল লোকটার। 'কালচারাল মিনিস্ট্রি?'

'হ্যাঁ।'

দু'চোখ জ্বলে উঠল হ্যারি রোমানের। 'আমাকে বোকা হিসেবে ট্রীট না করলে খুব খুশি হব, মিস্টার দারভিশ। আমার বিশ্বাস আপনারা কেন এসেছেন, তা আমি জানি।'

'সত্যি?' বাঁকা হাসি ফুটল তার মুখে। 'কি করে বলুন তো?'

কিন্তু গায়ে মাখল না সে। 'আপনাদের পাসপোর্ট রিসেপশন থেকে সীজ করেছি আমি নিরাপত্তার খাতিরে। ফিরে যাওয়ার সময় ফেরত পাবেন। এরমধ্যে, আমার অনুমতি না নিয়ে রাজধানীর বাইরে যাবেন না আপনারা দয়া করে। আমি কাল কথা বলব হিজ এক্সেলেন্সি শেখ আজিজ জাফরের সাথে, প্রয়োজন বুঝলে হিজ ম্যাজেস্টি সুলতানের সাথেও কথা বলব। তারপর পরবর্তী নির্দেশ জানাব। দয়া করে এমন কিছু করবেন না যাতে আমি কঠিন কোন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হই।' পকেট থেকে একটা ভিজিটিঙ কার্ড বের করল।

'এটা রাখুন, আমার ফোন নাম্বার। কাজে লাগতে পারে।'

বেরিয়ে গেল মেজর হ্যারি রোমান। বাইরে থেকে রূমের দরজা টেনে দিতে ভুল করল না।

স্থানীয় সময় রাত দেড়টায় ঘাট ছাড়ল গালফ পার্ল। রিক ক্লে হুইলের দায়িত্বে, সার্জেন্ট দারভিশ হামাম আছে তার সাথে। ফোর ডেকে দুই ডেক চেয়ারে বসা টোকিও ও জামাল শামলু।

বন্দর থেকে সরে এসে সর্বোচ্চ বিশ নট্ বেগে ছুটল খুদে স্যালভেজ শিপ, গন্তব্য পাকিস্তানের জলসীমা। টিমটিমে তারার আলোয় টানা সোয়া ঘণ্টা চলার পর দারভিশের চোখে প্রথম ধরা পড়ল সঙ্কেতটা। মাঝসাগরে মিট্-মিট্ করছে লালচে হুড পরানো

একটা আলো-মোর্স। ক্লের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। 'ওই দেখুন! আলো।'

তাকাল সে। অন্যরাও দেখল। গতি কমে গেল, ঘুরে সঙ্কেতমুখো হলো বোট। এগোল ধীরগতিতে। আলোর উৎসটাও বসে নেই, চলছে। অনেক কাছে পৌঁছেও ওটা কি, ঠাহর করতে না পেরে অবাক হলো ক্লে। এতক্ষণে আকাশের গায়ে জিনিসটার কাঠামো ফুটে ওঠার কথা ছিল, অথচ তা হয়নি। তারপর, একেবারে আচমকা দেখা দিল ওটা। ক্লে-টৌকিও তো বটেই, ওরা দুজন পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল। এমন জিনিস কেউই আশা করেনি।

ওটা অত্যাধুনিক এক সাবমারসিবল বোট, পিসি ১২০২। আমেরিকার তৈরি ৩১ ফুট লম্বা মিনি সাবমেরিন। পানির তলায় স্যালভেজের কাজে ব্যবহার হয় সাধারণত। সঙ্গে আরও দুই অদ্ভুত খুদে নৌযান। ওয়াটার স্কূটার। বেলজিয়ামের তৈরি, দুই এঞ্জিনের। বডি লাইটওয়েট কেভলার আর্মার শীট ও R A M ধাতুর-শেষেরটার জন্যে রাডারের চোখ এড়িয়ে চলতে পারে ওগুলো। জেট রেইডার নাম।

মিনি সাবমেরিনের দুপাশে দুই স্কূটারে বসে আছে মাসুদ রানা ও লে. আতাসী। হাসছে।

'হোলি ক্রাইস্ট!' হুঁশ ফিরতে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল ক্লে। বিস্ফারিত চাউনি। বাকি তিনজনেরও কমবেশি একই অবস্থা। দৃষ্টি বিনিময় হলো ক্লে-টৌকিওর।

হাত নাড়ল রানা। 'হ্যালো, চায়না ক্লে! লং টাইম নো সী, কেমন আছ?'

জবাব দূরে থাক, মুখে ভাষাই জোগাল না মানুষটার। ওদিকে দারভিশ অদ্ভুত চোখে রানাকে দেখছে। স্ফিংসের ভঙ্গি হারিয়েছে সে, উজবুকের মত দেখাচ্ছে এখন। বাকি দু'জনের অবস্থা বর্ণনার

অতীত।

'আরে, কি দেখছ অমন করে?' বলল রানা। 'এর কোনটাই অচেনা নয় তোমার। জলদি, উঠতে সাহায্য করো আমাদের।'

পরের আধঘণ্টা ব্যস্ততার মধ্যে কাটল সবার। চকচকে হলুদ রঙের সাবমেরিনটাকে ঝোলানো হলো বোটের স্টারবোর্ড ডেভিটের সাথে, দুই স্কুটারের জায়গা হলো আফটার ডেকে। কাজ সেরে ফিরতি পথ ধরল গালফ পার্ল। হুইল হাউসে ক্লের পাশে দাঁড়াল এসে মাসুদ রানা। 'তারপর? কেমন আছ তুমি, ক্লে?'

আড়চোখে তাকাল সে। 'ভাল। তুমি?'

মাথা দোলাল ও। 'ভাল।' কফি নিয়ে টোকিওকে ঢুকতে দেখে কৃতজ্ঞ হলো। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চুমুক দিল।

'রানা, এসব কেন?' লোকটা চলে গেলে প্রশ্ন করল ক্লে। 'কি কাজে লাগবে জিনিসগুলো?'

'তোমার জন্যে আমার তরফ থেকে উপহার হিসেবে এনেছি এসব।'

'হোয়াট!' ঢোক গিলল লোকটা। 'আমার জন্যে! এতসব দামী...'

'দাম বড় কথা নয়, ক্লে, বন্ধুত্ব বড়। বন্ধুর জন্যে উপহার কেনার সময় আমি দাম নিয়ে মাথা ঘামাই না।'

তিক্ত হাসি ফুটল ডাইভারের মুখে। 'এখন বুঝতে পারছি, আমাকে নিশ্চই কোন বেআইনী কাজে তোমার সঙ্গী করতে কৌশলে বাধ্য করতে চাইছ তুমি। এই জন্যেই ফোনে ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলে সেদিন, তাই না?'

চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল ও। মৃদু কুঁচকে উঠল কপাল। 'আমাদের মধ্যে অনেকদিন যোগাযোগ নেই সত্যি, ক্লে, কিন্তু তাই বলে আমার সম্পর্কে তুমি এমন একটা ধারণা করবে ভাবতে

পারিনি।' একটু থামল। 'তুমি শিওর থাকো, এগুলো তোমার জন্যে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবেই এনেছি। নোংরা কোন স্বার্থ নেই পিছনে। তোমার প্রায় সব খবরই রাখি আমি, সব বন্ধুরই রাখি। আমি জানি তোমার অবস্থা। তোমার লাইনে আগের মত বড় বড় কন্ট্র্যাক্ট ধরতে হলে এসবের কোন বিকল্প নেই, তাই এগুলো আনা। তোমাকে আমার কাজে সঙ্গী হতে বাধ্য করার কথা আমি চিন্তাই করিনি। আর আমি কোন বেআইনী কাজেও আসিনি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল রিক ক্লে। রানা সিগারেট টানছে নীরবে। রাডার স্ক্রীনের গাঢ় সবুজ আলোয় ওর গম্ভীর চেহারা অদ্ভুত শান্ত, সমাহিত দেখাচ্ছে। এঞ্জিনের চাপা গুঞ্জন ও বাইরে বো-র পানি কাটার আওয়াজ ছাড়া আর সব নীরব। ছোট্ট একফালি চাঁদ ছিল আকাশে, কখন ডুবে গেছে খেয়াল করেনি কেউ। পুব আকাশে আলো ফুটতে বেশি দেরি নেই।

'কাজটা কি, রানা?' একসময় প্রশ্ন করল ক্লে।

'বলব। সময় হোক।'

ওর কাঁধে হাত রাখল ক্লে। 'আমি দুঃখিত, বন্ধু। কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি আমি। মাফ করে দাও।'

'ভুলে যাও,' তার হাতে চাপড় মারল ও। 'অনটনে থেকেও লোভের ফাঁদ এড়িয়ে চলার মত মনের জোর তুমি আজও হারাওনি দেখে আমি বরং খুশি হয়েছি।'

'ধন্যবাদ, রানা। উপহারগুলোর জন্যে আরেকবার।'

'ইউ ওয়েলকাম।'

'কিন্তু এগুলো দেখে পোর্ট অথরিটি যদি ঝামেলা...'

'কিছুই করবে না ওরা। দুপুরের মধ্যে এসবের ক্লিয়ারেন্স, হ্যান্ডলিঙ অর্ডার, সব পেয়ে যাবে তুমি। কেউ একটা আঙুলও তুলবে না।'

ওর দৃঢ় আস্থা দেখে ভারি বিস্মিত হলো ক্লে। 'তা কি করে সম্ভব! ওরা জানে আমার পয়সা নেই। হঠাৎ করে এতসব...'

'ওটা কোন ব্যাপার নয়?' মুচকে হাসল রানা। 'পয়সা নেই বলেই সেদিন তুমি টেলিফোনে আমাকে অনুরোধ করেছ তোমার স্যালভেজ কোম্পানির জন্যে এগুলো জরুরী দরকার, যদি সম্ভব হয় আমি যেন আসার সময় কিনে নিয়ে আসি। পয়সা তুমি পরে দেবে। ব্যস্, হয়ে গেল সম্ভব!'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রিক ক্লে। 'তা...ইয়ে, সে না হয় হলো, কিন্তু এসব নিয়ে কিভাবে এলে তোমরা? কোন্ পথে? মাঝ সাগর থেকে আমার বোটে চড়ে এসেছ, যদি জানাজানি হয়?'

'যা সত্যি নয় তা জানাজানি হওয়ার প্রশ্ন আসে কি করে?' আকাশ থেকে পড়ল ও।

'সত্যি নয়!' মহাবেকুবের চেহারা হলো লোকটার।

'নিশ্চই না! আমরা এসেছি বাংলাদেশ বিমানে চড়ে!' মারফতী হাসি ফুটল রানার মুখে। 'ফ্লাইট নাম্বার বিজি ফোর টোয়েন্টি, আই মীন, ফোর ও টু আরকি! সকাল সাতটায় ল্যান্ড করবে ওটা। এয়ারপোর্টে সে রেকর্ড থাকবে, আমাদের পাসপোর্টে এন্ট্রি সীল থাকবে। তোমার পিসি আর স্কুটারও প্লেনেই এসেছে। কোন চিন্তা নেই, সকাল ন'টার মধ্যে ক্রেট পৌঁছে যাবে তোমার বোটে। মন্ত্রী আজিজ জাফরের নামে এসেছে এসব, পাঁচ মিনিটে ছাড় হয়ে যাবে দেখো।'

দীর্ঘ সময় মুখ বন্ধ করার কথা মনেই থাকল না ডাইভারের। সচকিত হয়ে মাথা দোলাল ধীরে ধীরে। 'মাই গড, রানা! আর কি কায়দা জানো?' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'এসএএসের মেজর হ্যারি রোমানের কথা তোমার মনে আছে, রানা?'

'খুব,' গম্ভীর হয়ে উঠল ও।

'সে এখন...'

'আমি জানি ও কোথায় আছে। কোন পদে তাও। ওকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই, ক্লে। আমি সামলাব।'

'অনেক ক্ষমতা রোমানের। হিজ ম্যাজেস্টিস সুলতান কাবূজের সাথে বেশ দহরম-মহরম। আমিও ব্রিটিশ, রানা, চাকরিও একসঙ্গে করেছি। তবু ওকে কেন যেন ভরসা হয় না। লোকটা আগেও দেমাগী ছিল, এখন হয়েছে আরও। পয়সার এত গরম, আজকাল আমাকে চিনতেই পারে না। দেখেও না দেখার ভান করে। যদি কিছু সন্দেহ করে রোমান, ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটে যেতে পারে। তারওপর তোমাকে ও দু'চোখে দেখতে পারে না।'

'কিছুই করবে না ও, ক্লে,' সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল রানা। 'সময়মত আমি কথা বলব ওর সঙ্গে।'

'তুমি জানো, লোকটা দারভিশ আর জামালের পাসপোর্ট আটক করেছে?'

'শুনেছি। জানতাম করবে।'

'জানতে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা।

বাংলার গৌরব। মুসানডেম পেনিনসুলা। গভীর রাত।

ক্যামোফ্লেজ ড্রেপ দিয়ে ঢাকা হুইল হাউসে বসে আছে 'অপারেশন যেনেক' কমান্ডার ইয়েহোনাথান নেতানিয়াহু। চেহারায় গভীর আত্মতৃপ্তি। ফার্স্ট অফিসার ফখরুল হাসানকে হাঙরের মুখে ছেড়ে রেখে আসা মন্দ হয়নি, ভাবছে সে। বরং ভালই হয়েছে। একটা ঝামেলা ছিল ব্যাটা। তুলে আনলে ফের কোন্ সমস্যা বাধিয়ে বসত কে জানে?

কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে নেতানিয়াহু। কাল থেকে বাংলার

গৌরবের রাডারে একটা নৌযানের অবস্থান ধরা পড়তে শুরু করেছে। বেশ দূরে আছে ওটা অবশ্য। এদিকে আসছে। মাদারশিপ। ওই জাহাজে চড়েই এসেছে তার দল। আশা করা যায় আগামী তিনদিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে এখানে।

তারপর, বাংলার গৌরবের কার্গো মাদারশিপে তুলে নিয়ে কেটে পড়বে যেনেক কমান্ডো ইউনিট। কাগজের ইতিহাসে না হোক, মনের ইতিহাসে ইসরাইলের আরেকটা সফল অভিযানের কথা সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে চিরকালের জন্যে। পরিতৃপ্তির হাসি ফুটল কমান্ডারের চৌকো মুখে।

জেরুজালেম অনর্থক দুশ্চিন্তা করছে। ওকে সতর্ক থাকতে বলার কোন দরকার ছিল না যাহালের। কারণ সে সতর্কই আছে। সতর্ক আছে, এবং নিজের কাজ খুব ভাল বোঝে সে। বোঝে বলেই এখনও নিরাপদ আছে। নইলে প্রথম ক'দিন আকাশ থেকে যেভাবে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, তাতে ধরা না পড়ে উপায় ছিল না। হাসি আরও চওড়া হলো তার, কিন্তু চোখ ছুঁলো না।

ছোঁয় না কখনও।

হঠাৎ করে বাইরে একজোড়া পায়ের দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দে চোখ কুঁচকে উঠল ইয়েহোনাথানের। কে! উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় খোলা দরজায় তার এক সঙ্গী এসে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে। 'ঝামেলা!'

বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল তার। 'কি?'

'ফাৎনা নড়ছে।'

আট

অ্যাপয়েনমেন্ট অনুযায়ী ঠিক দশটায় শেখ আজিজ জাফরের আউটার অফিসে পৌঁছল মাসুদ রানা। ওকে দেখামাত্র আনন্দে চোখ জ্বলে উঠল বৃদ্ধের, প্রটোকল ভুলে হতভম্ব পি.এসের সামনে দু'হাত বাড়িয়ে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এলেন। 'আহ্, রানা! মাই সান! আহ্লান ওয়া সাহ্লান, আহ্লান ওয়া সাহ্লান!'

'এক্সেলেন্সি...' আলিঙ্গনের চাপে বুকের বাতাস সব বেরিয়ে যাওয়ায় আর কিছু বলার সুযোগ পেল না ও। এক-আধটা হাড়ে চিড় ধরার আগে নিজেকে ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম, রানা! খুব খুশি হলাম,' দু'হাতে ওর কাঁধ ধরে এক পা পিছিয়ে গেলেন মন্ত্রী। কয়েকবার চোখ বোলালেন আপাদমস্তক, হাসি আর ধরে না। 'বহু বছর পর দেখা হলো। ওহ্, হাউ আই মিসড্ ইউ, সান!'

'এক্সেলেন্সি...'

হাত দিয়ে বাতাসে বাড়ি মারলেন তিনি। 'নো এক্সেলেন্সি, রানা। আগে যে সম্পর্ক ছিল আমাদের, এখনও তা অটুট আছে। আমরা বন্ধু ছিলাম, রিমেমবার? সিম্পলি আজিজ, প্লীজ।'

'ধন্যবাদ।' একটু পিছনে দাঁড়ানো আতাসীকে দেখল রানা। মন্ত্রীর পাকিস্তানী পি.এসের মত সেও আহাম্মকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে

আছে। 'এ আমার এক বন্ধু, ইওর...ইয়ে, আজিজ। আতাসী এর নাম।'

আরেক দফা আন্তরিক কোলাকুলি-হ্যান্ডশেক ইত্যাদি সেরে ভেতরে যাওয়ার জন্যে ঘুরলেন মন্ত্রী রানার শার্টের আস্তিন খামচে ধরে। 'এসো। অফিসে বসি।' ভেতরে এসে রুমের কোনায় পাতা এক সেট সোফার দিকে এগোলেন। 'এখানে বসা যাক আরাম করে।'

বসতে না বসতে কফি, চিকেন স্যান্ডউইচ, কেক, খেজুর এল। এবং দুই মিনিটের মধ্যে রুমের পরিবেশ পাল্টে গেল। হাসির রেশ পর্যন্ত নেই রানা বা শেখ জাফরের চেহারায়। 'পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো, রানা?' কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন মন্ত্রী।

'না। ধন্যবাদ।'

'এনওসি?'

'আপনার কথামত কাস্টমস সুপার পাঠিয়ে দিয়েছেন বোটে।'

'ও হ্যাঁ, এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছিল ওরা। "আমার" মাল পৌঁছে গেছে। ড্রাইভার পাঠিয়ে দিয়েছি আমি।'

'ধন্যবাদ।'

'এতসব কি নিয়ে, রানা? ব্যাপার কি?'

কফি শেষ করল ও। সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে দমন করল। কারণ বিল্ডিঙে ঢোকার মুখে বড় করে লেখা 'ধূমপান নিষেধ' সাইন দেখে এসেছে। কিছু গোপন না করে পুরো ঘটনা ধীরেসুস্থে খুলে বলল ও। প্রশ্ন না করে কেবল শুনে গেলেন মন্ত্রী। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে পুরু কার্পেটে পা ঠুকলেন বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর মুখ তুলে আতাসীর উদ্দেশে অনেকটা জবাবদিহির সুরে বললেন, 'আপনাদের আমরা টাকা দিয়ে সাহায্য করিনি বটে,

তবে এর পিছনে আমাদের সুলতানের, ওমানী জনগণের পুরো সমর্থন আছে। ইয়াসির আরাফাত সুলতানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'জানি, ইওর এক্সেলেন্সি,' মাথা ঝাঁকাল বেদুইন। 'সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই দুর্ঘটনা আমাদের অনেক বড় সমস্যায় ফেলে দিয়েছে।'

মৃদু হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'কেটে যাবে সমস্যা, থাকবে না। আল্লাহ অসীম দয়াশীল।' রানার দিকে ফিরলেন। 'তোমার লোক, কি যেন নাম, স্ফিংসের মত?'

হাসল ওরা দু'জন। রানা বলল, 'দারভিশ হামাম।'

'হ্যাঁ, দারভিশ। ওর মুখে কাল ঘটনা মোটামুটি জানার পরই ওটাকে খুঁজে বের করার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি আমি। উঁম্‌ম্‌...মনে হয় ছোট্ট একটা খবর পেয়েও গিয়েছি এরমধ্যে।'

রানা খুব একটা অবাক না হলেও আতাসী হলো। ঘাড়-কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে উঠল তার। 'কি সেটা?' প্রশ্ন করল রানা।

'আমাদের ডিফেন্ডার মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্র্যাফটের এক পাইলট কাল ফোন করেছিল আমাকে। আমার ট্রাইবের ছেলে। বলল, তোমাদের জাহাজ নিখোঁজ হওয়ার একদিন কি দু'দিন পর একটা অদ্ভুত ব্যাপার নাকি ঘটেছে। ওদের রাডারে একটা ডিসট্রেস বীকন ট্রান্সমিশন ধরা পড়েছে—সার্বি। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের জন্যে মাত্র, ঠিকমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই থেমে গেছে। ওদের ধারণা বাধা দেয়া হয়েছে।'

'কোত্থেকে এসেছে?'

'মুসানডেম পেনিনসুলা।'

'সেটা কোথায়?' আতাসী প্রশ্ন করল।

'হরমুজ প্রণালীর দক্ষিণ উপকূলে। বড় কঠিন জায়গা। অনেক দূরে, বিচ্ছিন্ন কিছু ইনলেট আর ক্লিফের সমষ্টি। দেখলে মনে হয়

নরওয়ের ফিওর্ডের (Fjord) কিছু অংশ তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে কেউ ভুল করে। ওমান আর আরব আমিরাতের বর্ডারে জায়গাটা।'

আরেক দফা কফি পাঠাবার হুকুম দিলেন জাফর আজিজ। বলে চললেন, 'সিগন্যাল পেয়েই ওই এলাকায় গিয়েছিল সে। কিন্তু কয়েক চক্কর দিয়েও কোন জাহাজের দেখা না পেয়ে ফিরে এসেছে। অথচ একটা সৌদী শিপও সঙ্কেতটা রিসিভ করেছে। ওরা পুরো এলাকা জুড়ে খুঁজেছে ওটাকে। পায়নি।'

'তাহলে ওখানেই আছে,' চিন্তিত গলায় বলল রানা।

'হতে পারে,' মাথা দোলালেন মন্ত্রী। 'কিন্তু ওরা তাহলে দেখতে পেল না কেন?'

'হয়তো ক্যামোফ্লেজ ড্রেপস দিয়ে ঢাকা ছিল।'

চোখ বুজলেন জাফর আজিজ। 'এ সম্ভাবনার কথা তো ভেবে দেখিনি। হ্যাঁ, তাই হয়েছে। ব্যাপারটা ওরা ধরতে পারেনি।'

ইন্টারকমের রিং শুনে ক্ষমা চেয়ে উঠলেন মন্ত্রী, ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডসেট তুললেন। 'ইয়েস! কে?...কেন?...ওহ্। সমস্যা হয়েছে কিছু?...অ্যাঁ? দাঁড়াও, এক মিনিট।'

মাউথপীস চেপে ধরে ওদের দেখলেন তিনি। 'রানা, আমাদের অ্যান্টি টেররিস্ট সংস্থার চীফ দেখা করতে এসেছে। মেজর হ্যারি রোমান। তোমার লোককে এনওসি ইস্যু করার ব্যাপারে কমপ্লেন জানাতে এসেছে।'

'তাই নাকি? ভাল হলো, ওকেই খুঁজছিলাম মনে মনে। ডাকুন ওকে, এই চান্সে জরুরী আলাপটা সেরে ফেলি।' নির্বিকার চেহারা রানার।

'কি বলছ?' চোখ বড় হয়ে উঠল জাফর আজিজের।

'ঠিকই বলছি, আজিজ। কথা এমনিতেও বলতে হত ওর

সঙ্গে, আপনাকে সাক্ষী রেখে বলা গেলে চমৎকার হবে।'

তবু দ্বিধা কাটতে চায় না তাঁর। 'ও হিজ ম্যাজেস্টি'স...'

'জানি আমি। জেনেই বলছি।'

কয়েক সেকেন্ড ওকে দেখলেন মন্ত্রী, তারপর যথেষ্ট দ্বিধার সাথে হ্যান্ডসেট কানে লাগালেন। 'ওকে, পাঠিয়ে দাও।'

ঢুকল মেজর রোমান। 'সরি, ইওর এক্সেলেন্সি। জরুরী কাজ বলে ডিস্টার্ব করতে হলো। কাজ দুটো...' রানার ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল সে মাঝপথে। দেখে মনে হলো আকাশ থেকে পড়েছে। 'তুমি! তুমি কখন...'

'হ্যালো, রোমান!' অমায়িক ভঙ্গিতে হাসল ও।

অপ্রস্তুত, বিচলিত চোখে মন্ত্রীর দিকে ফিরল লোকটা। 'ইওর এক্সেলেন্সি, এই লোক...এই লোক...' থেমে আতাসীকে দেখল কড়া চোখে।

'কি হয়েছে, মেজর?' প্রশ্ন করলেন জাফর।

'একে...এদেরকেও আপনি এনওসি দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। কেন?'

রানার দিকে ফিরল সে। 'কখন এ দেশে ঢুকেছ তুমি, রানা?'

'আজ সকালে।'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল ওএটিএ চীফকে। 'কোত্থেকে এসেছ?'

'করাচী। কেন?'

জাফর বাধা দিলেন। 'মেজর, তুমি আমার গেস্টের সাথে...'

'ইওর এক্সেলেন্সি!' ঘোলা, খেপাটে দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'আমি দুঃখিত। কিন্তু এ মুহূর্তে হিজ ম্যাজেস্টি কাবুজের ব্যক্তিগত নির্দেশের অধীনে কাজ করছি আমি, দয়া করে বাধা দেবেন না। পরে প্রয়োজনে এ জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেব। কোন হোটেলে উঠেছ তুমি, রানা?'

'উঠিনি এখনও। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এখানে এসেছি।'

হাত বাড়িয়ে রীতিমত হুকুম করল সে, 'পাসপোর্ট দাও।'

দিল রানা। আতাসীকেও দিতে বলল। ব্যস্ত হয়ে ও দুটোর পাতা ওলটাতে শুরু করল রোমান। হতবিহ্বল মন্ত্রীর দৃষ্টি রানা ও রোমানের ওপর ছুটে বেড়াচ্ছে। ঝট্ করে মুখ তুলল মেজর। রানার আশঙ্কা হলো জাল ভিসার ব্যাপারটা হয়তো ধরে ফেলেছে, কিন্তু না, অতসব ধৈর্য ধরে চেক করার মত মনের অবস্থা নেই তার।

'তোমাদের পাসপোর্ট আমি আটক করছি, রানা। নেক্সট ফ্লাইটে ওমান ছেড়ে চলে যাবে তুমি। তোমরা সবাই! এখন বুঝতে পারছি, দারভিশ আর জামাল, ওরাও...'

'হ্যাঁ, ওরাও আমার সঙ্গী,' মন দিয়ে নখ পরীক্ষা করার ফাঁকে বলল রানা।

'তোমরা প্রত্যেকে বেরিয়ে যাবে আজ এ দেশ ছেড়ে।'

'যদি না যাই, কি করবে তুমি, জর্জ?'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো সম্বোধনটা শোনেনি সে, তারপরই চট্ করে তার দুই ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে উঠল। 'কি বললে?'

'জর্জ।'

আরও কুঁচকে উঠল কপাল, রাগের জায়গা দখল করছে অনিশ্চয়তা। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'ব্যবসার সার্কেলে এই নামটাই না ব্যবহার করো তুমি?' কৌতুক ফুটল রানার চেহারায়। 'জর্জ কাপলওয়েট?'

'কি যা-তা বলছ!'

'জর্জ কাপলওয়েট, ভাইস-চেয়ারম্যান, স্পাইডেক্স ইন্টারন্যাশনাল। জেরুজালেমের আনঅফিশিয়াল প্রতিনিধি, ওদের নোংরা ষড়যন্ত্রের...'

'রানা!' উত্তেজনায়-অবিশ্বাসে প্রায় আঁতকে উঠলেন জাফর। 'এসব কি বলছ তুমি!' দু'চোখ চুলের সীমানায় পৌঁছে গেছে। ঝুলে পড়েছে চোয়াল। ওদিকে রোমান ওরফে কাপলওয়েটের চেহারা থেকে রক্ত সরে যেতে আরম্ভ করেছে।

'ঠিকই বলছি, ইওর এক্সেলেন্সি।'

শেষ চেষ্টা করল লোকটা, যদিও বুঝে ফেলেছে তা আর সম্ভব নয়। 'কোথায় পেয়েছ তুমি এসব আজগুবি খবর?'

'হল অ্যান্ড অ্যাগনস্টে। চেনো নিশ্চই?' পকেট থেকে পুরু একটা খাম বের করল ও, মন্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিল। 'দেখুন।'

মাঝপথে থাবা দিয়ে ওটা কেড়ে নিল মেজর। ভেতরের কাগজপত্র বের করে চোখ বোলাতে লাগল ব্যস্ত হয়ে। তৃতীয় পাতায় পৌঁছে ধৈর্য হারাল। 'রাবিশ! জাল!' চট করে পকেটে ভরল সে ওগুলো। মন্ত্রীকে দেখতে দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই।

'ওগুলো কপি, রোমান। অরিজিন্যালগুলো লন্ডনে আছে, আমার সলিসিটরের কাছে।'

দৃষ্টি সতর্ক হয়ে উঠল মেজরের। 'কি চাও তুমি, রানা?'

'সোজা। মালসহ জাহাজ।'

'মাই গড, রানা! তুমি এত বদলে গিয়েছ? সন্ত্রাসীদের সাহায্যে…'

চাবুকের মত আঘাত হানল রানার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। 'কারা সন্ত্রাসী, রোমান? কাদের তুমি সন্ত্রাসী বলছ? যাদের টাকা ছিল না, শক্তি ছিল না, তোমাদের মত মুরুব্বি ছিল না, তারা? একদিন সকালে যাদের ঘুম ভাঙতে হাজার বছরের মাতৃভূমি ছেড়ে জানের ভয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল ফিলিস্তিন ইসরাইল হয়ে গেছে বলে, তারা সন্ত্রাসী? নিজের জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্যে যারা কাতারে কাতারে মরছে, শিয়াল-কুকুরের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটু

আশ্রয়ের আশায়, তারা? আর যারা ওদের ঘরছাড়া, দেশছাড়া করেছে, তাদের কি বলবে তুমি? বিশ্বশান্তির মহান পূজারী? সে কারা, রোমান? দুনিয়ার সম্পদ লুট করে নিজের গোলা ভরে বেড়ানো তোমার "মহান ব্রিটেন," না রেড ইন্ডিয়ানদের ভিটেমাটি ছাড়া করে যারা আজ দুনিয়ার মাথায় "গণতন্ত্রের" ছড়ি ঘোরাচ্ছে, সেই আমেরিকা?'

দম নেয়ার জন্যে থামল। রাগে কাঁপছে অল্প অল্প। 'ফিলিস্তিনীরা ওদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করছে। ওরা স্বাধীনতাকামী, সন্ত্রাসী নয়। সন্ত্রাসী তারা, একদিন যারা ওদের জমি, আশ্রয় কেড়ে নিয়ে ইহুদীদের হাতে তুলে দিয়েছিল। ইতিহাস যদি জানা না থাকে, জেনে নিয়ো। আর "সন্ত্রাসী" শব্দটা ব্যবহারের আগে জেনে নিয়ো ওটার আভিধানিক অর্থটাও। তাতে বুঝতে পারবে, ওটা কাদের নামের আগে বসানো সঠিক হবে।'

ওর তীক্ষ্ণ, জ্বালা ধরানো হুলের মত শব্দবাণের খোঁচায় দেখার মত হলো মেজরের চেহারা। ওদিকে মন্ত্রী জাফর ও আতাসী স্তম্ভিত। ফিলিস্তিনের ওপর রানার দরদ যে কত গভীর, আজ তা আরেকবার নতুন করে টের পেয়ে চোখ ভিজে উঠেছে বেদুইনের।

ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'জাফর, প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে আপনাদের সুলতানের পলিসি জানা আছে নিশ্চই আপনার?'

'হ্যাঁ,' সেন্ট মাখা দাড়ি দুলে উঠল বৃদ্ধের। 'অবশ্যই!'

'কিন্তু আপনাদের এই হাই অফিশিয়াল সিভিল সার্ভেন্টের নেই মনে হচ্ছে। দয়া করে বলুন একে।'

ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে মেজরের দিকে ফিরলেন তিনি। 'হিজ ম্যাজেস্টি সুলতান বিন কাবূজের পলিসি পরিষ্কার, তিনি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার স্বপক্ষে। ইয়াসির আরাফাত স্বাধীনতা

ঘোষণা করলে ওমান স্বীকৃতি দিতে দেরি করবে না।'

'তার মানে সুলতানের সরাসরি বিপক্ষে কাজ করেছ তুমি এ ব্যাপারে ইসরাইলীদের সাহায্য করে, কি বলো, মেজর?' বলল রানা।

আগুন ঝরা চোখে তাকাল সে। 'পলিসির ভেতরেও পলিসি থাকে। টপ্ সিক্রেট সার্ভিস ম্যাটার। তার সবকিছু এমনকি হিজ এক্সেলেন্সি জাফর আজিজের মত মন্ত্রীর কান পর্যন্তও পৌছায় না।'

'বেশ,' মাথা দোলাল ও। 'সুলতানকে ফোন করে কনফার্ম করা যাক ব্যাপারটা। অনেকদিন দেখা নেই তাঁর সাথে। গো অ্যাহেড, মেজর,' ফোন ইঙ্গিত করল। 'যোগাযোগ করো প্যালেসে।'

নড়ল না সে। গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

'তার মানে তোমার এসব তিনি জানেন না,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল ও। 'ওরা তোমাকে কত টাকা দিয়েছে খবরটার জন্যে, রোমান?'

'জাহান্নামে যাও!' দাঁতে দাঁত পিষল সে।

'জাহাজটা কোথায়?'

'জানি না।'

শ্রাগ করল রানা। 'ঠিক আছে, আমি নিজেই খুঁজে বের করে নেব। তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওদেরকে সতর্ক করতে যেয়ো না। যদি জাহাজ আর কোথাও সরিয়ে নেয়া হয়, আমি ফিরে এসে সুলতানকে জানাব সব। তোমার বউ-বাচ্চা পথে নামুক, আমি তা চাই না। আর আমার কোন ক্ষতি করার কথা ভুলেও মনে ঠাঁই দিয়ো না।

'যদি সময়মত লন্ডন না ফিরি আমি, আমার সলিসিটর হিজ ম্যাজেস্টি সুলতান কাবূজের সাথে যোগাযোগ করবে। তাছাড়া

হিজ এক্সেলেন্সি আজিজ তো সাক্ষী থাকলেনই সবকিছুর। তিনি এটাও দেখবেন, আমি জাহাজ উদ্ধার না করা পর্যন্ত তুমি বা তোমার পরিবারের কেউ যেন এ দেশের বাইরে যেতে না পারে। ইওর এক্সেলেন্সি!'

'শিওর, রানা!' মাথা ঝাঁকালেন মন্ত্রী। 'অবশ্যই দেখব।'

অনেকক্ষণ পর নিজেকে খুঁজে পেল মেজর রোমান। চেহারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে এরইমধ্যে। 'তুমি জানো কোথায় আছে জাহাজটা?' দূরাগত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'না। তবে জেনে নেব।'

'শোনো, রানা,' অনুনয়ের সুর ফুটল লোকটার বলার মধ্যে। 'যদি ওটাকে দখল করার কথা ভেবে থাকো, তাহলে বাদ দাও সে চিন্তা। হোলসেল জেনোসাইড ঘটে যাবে তাহলে। দু'দিন সময় দাও, আমি এর মধ্যে ওদেরকে তোমার শিপ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে খবর পাঠাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ। তার দরকার নেই।'

'ভেবে দেখো রানা, জাহাজে তোমার দেশী ক্রুরা আছে। ওরা যোদ্ধা নয়, ক্রস ফায়ারে পড়ে শুধু শুধু মরবে মানুষগুলো।'

'আজ হঠাৎ ওদের কথা কেন মনে জাগল তোমার, রোমান?'

'আমি তোমাকে ভাল পরামর্শ দিচ্ছি, রানা,' বলল সে।

'দুঃখিত, রোমান। আমি শুনলেও ইসরাইলীরা তোমার পরামর্শ শুনবে না। হয় কেটে পড়বে জাহাজ নিয়ে, নয়তো ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। ওরা তোমাদের তৈরি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, স্বার্থবিরোধী কিছু ঘটবে বুঝলে লন্ডন-ওয়াশিংটনকেও পাত্তা দেয় না। আমার মনে হয় তুমি ভালই জানো সে কথা।'

হাত বাড়াল ও। 'পাসপোর্ট দাও! দারভিশ আর জামালের

পাসপোর্টও দুপুরের মধ্যে ফেরত চাই আমি।'

মাসকাট শেরাটন। রাত এগারোটা।

এইমাত্র মিনা কাবূজ থেকে ফিরেছে রানা কাল ভোরে মুসানডেম রওনা হওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে। জাহাজটা কোথায় আছে জানার পর থেকে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে আতাসী। দারভিশ আর জামানও সংক্রমিত হয়েছে। ভেতরে ভেতরে অস্থির ওরা সবাই, উত্তেজিত। সম্ভব হলে রাতেই ছোটে, এমন অবস্থা।

নিরাপত্তার কথা ভেবে ওদের বন্দর থেকে আট মাইল দূরের এক জনবসতিহীন দ্বীপে রেখে এসেছে রানা। সকালে যাওয়ার পথে তুলে নেবে।

রিক ক্লে সম্পর্কে ওর ধারণা শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়েছে। এক কথায় রাজি হয়েছে সে প্রস্তাবে, প্রাণ হারাবার আশঙ্কা আছে জেনে পিছপা তো হয়ইনি, বরং বিষয়টা নিয়ে দ্বিতীয়বার ভেবে দেখার কথাও গায়ে মাখেনি। জাপানী ডাইভারও যাচ্ছে ওদের সাথে, অবশ্য পাইলট হিসেবে। তাকে অ্যাকশনে নামাবার ইচ্ছে নেই ওর।

শুতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় ফোনের রিঙ শুনে অবাক হলো। প্রায় বারোটা বাজে, কে হতে পারে? 'ইয়েস?'

'রিসেপশন হিয়ার, স্যার। হিজ ম্যাজেস্টিস কালচারাল মিনিস্টারের সোফার আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে।'

'পাঠিয়ে দিন। ধন্যবাদ।'

'মোস্ট ওয়েলকাম।'

দু'মিনিট পর হাজির লোকটা। মাহমুদ। শেখ জাফরের ছোট একটা নোট নিয়ে এসেছে। ওটা এরকম: রানা, এক্ষুণি চলে

এসো, জরুরী। আজিজ

পাঁচ মিনিট পর হোটেলের গেট দিয়ে হুশ্ করে বেরিয়ে গেল মন্ত্রীর প্রকাণ্ড সরকারী গাড়ি–রয়্যাল ব্লু মার্সিডিজ। পাতলা হয়ে আসা ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে বেদম গতিতে দক্ষিণ শহরতলির দিকে ছুট লাগাল। পনেরো মিনিট পর পৌঁছল মন্ত্রীর বিশাল বাসভবনে। সামনের লনে পায়চারি করছিলেন আজিজ, ওকে নিয়ে ওখানেই পাতা সোফায় বসলেন।

'কাম, মাই ডিয়ার। ভাল একটা খবর আছে।' ভেতরে কফির নির্দেশ পাঠালেন।

'মুসানডেম থেকে আমার এক পরিচিত মানুষ একটু আগে যোগাযোগ করেছিল। ব্রিটিশ সে, ওখানে কূপ খোঁড়ার কাজ করে। এঞ্জিনিয়ার। বহুদিন থেকে ওই এলাকায় আছে। পুরো পেনিনসুলা সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা তার, সব চেনে। সে বলল, জেলেদের মধ্যে নাকি গত কয়েকদিন থেকে একটা গুজব চলছে ওখানে।'

'কি গুজব?'

ভারতীয় ম্যানসার্ভেন্ট কফি রেখে ফিরে যাওয়ার পর জবাব দিলেন জাফর। 'একটা ভৌতিক শিপ দেখেছে তারা ওখানে।'

'ভৌতিক?' ধূমায়িত কফিতে চুমুক দিল রানা।

'হ্যাঁ। কারণ জাহাজটা ওদের চোখের সামনে থেকে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে রাতারাতি।'

'উধাও মানে?' বিস্ময় ফুটল ওর কণ্ঠে।

'এক ফিশিং বোটের জেলেরা দেখেছে ওটাকে। বিরাট জাহাজ। সন্ধের পর সমস্ত আলো নেভানো অবস্থায় এক ব্লাইন্ড ইনলেটে ঢোকে ওটা। জেলেদের সম্ভবত দেখেনি ওরা। সে যা হোক, সারারাত মাছ ধরে গ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় অতবড় জাহাজটা ওরকম জায়গায় কেন ঢুকল, দেখতে গেল জেলেরা।

গিয়ে দেখে নেই ওটা। অথচ ওরা রাতভর ইনলেটের মুখের কাছেই মাছ ধরেছে, ওটাকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি কেউ। সঙ্গে সঙ্গে গুজব ছড়াতে শুরু করে।'

'ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আর কোন পথ আছে?'

'না,' মাথা দোলালেন আজিজ জাফর। 'নেই।'

'শিওর?'

'হানড্রেড পার সেন্ট।'

একটু ভাবল রানা। 'তাহলে এখনও ওখানেই আছে জাহাজ। ক্যামোফ্লেজ ড্রেপস্ দিয়ে ঢাকা ছিল বলে দেখতে পায়নি জেলেরা।'

'হতে পারে।'

'আপনার এই এঞ্জিনিয়ার কোথায় থাকেন? তার সাথে দেখা করতে চাই আমি। আরও ডিটেইলড শুনতে হবে।'

'নিশ্চই!' পকেট থেকে হাতে আঁকা একটা ম্যাপ বের করে দিলেন মন্ত্রী। 'রাস সারকান নামে এক দ্বীপে আছেন ভদ্রলোক, ম্যাপে মার্ক করা আছে। বড় ম্যাপ থেকে সেক্রেটারিকে দিয়ে আঁকিয়েছি বলে সুবিধের হয়নি কাজটা। তবে তোমার কাজ চলে যাবে।'

'আমার জন্যে অনেক করলেন, আজিজ। মনে থাকবে আমার। ধন্যবাদ।'

'লৌকিকতা ছাড়ো, রানা। দোয়া করি যেন ভালয় ভালয় কাজ উদ্ধার করে ফিরে আসতে পারো। মেজর রোমানকে নিয়ে চিন্তা নেই। এখন ওকে আমি যেমন নাচাব, তেমনি নাচতে বাধ্য হবে। ওর পিছনে কয়েকজনকে লাগিয়েছি, সামান্য বেচাল দেখলে...বাট, দেন, নিজের জন্যে কুয়ো নিজেই খুঁড়েছে ব্যাটা। ও শেষ। আজ না হোক কাল।'

সন্তুষ্ট মনে ফিরে চলল ও। যথেষ্ট ধকল গেছে গত দু'দিন। আজ কেটেছে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে। দুপুরে মন্ত্রীর সাথে কয়েকটা জটিল ব্যাপার নিয়ে লম্বা বৈঠক সেরে কাছের এক দ্বীপ মাসিরাহ যেতে হয়েছিল। ওমান এয়ারফোর্সের ৮ম স্কোয়াড্রনের বেজ ওখানে। ওদের এক পাকিস্তানী অফিসার রানার বন্ধু। আসার আগে ফোনে তার সাথে কথা বলেছে ও, আজ সেরেছে বাকিটা।

দিনের শেষ কাজ ছিল কেনাকাটা। সব সারা হয়েছে। এবার...

নয়

সন্ধের আগে প্রায় একশো মাইল পথ পেরিয়ে এল গালফ পার্ল। একটানা পনেরো নট বেগে ছুটছে। মাঝে পনেরো মিনিট ব্যয় হয়েছে দারভিশ ও জামালকে তুলে নিতে।

গাঢ় গোলাপি আকাশের পটভূমিতে জেবেল বানি জাবির উপত্যকার সাগরের ওপর ঝুলে থাকা অংশ দেখে রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ক্লে। 'ওপাশে বড় ফিশিং ভিলেজ আছে। কয়েকজনকে চিনি। খোঁজ নিয়ে দেখা যাক, কি বলো?'

'ঠিক আছে,' মাথা দোলাল ও।

আরও খানিকটা এগোতে বাদামী পাথরের টানা সৈকত দেখা দিল। বড় একটা লেগুন সামনে। প্রচুর জেলে আছে এখানে,

অনেক ঘর। সন্ধে ঘনাতেই আলো জ্বলে উঠেছে ঘরে ঘরে।

'এরা কিন্তু আরব নয়,' মন্তব্য করল রিক ক্লে।

'তাহলে?'

'শিহা বলা হয় এদের। ফারসীর কাছাকাছি এক ভাষায় কথা বলে। নেটিভ ভাষা। পূর্ব পুরুষরা ছিল আধা ওমানী আধা ফুজারান। কয়েক পুরুষ ধরে মাছ ধরা এদের পেশা। শহুরেদের তেমন পছন্দ করে না, বিচ্ছিন্ন থাকতে ভালবাসে। এরা গুজব ছড়াতে ভারি ওস্তাদ। একেকটা জেলে দ্বীপ কত দূরে দূরে, অথচ গুজব যখন জন্ম নেয়, আমার বোটের হাইয়েস্ট স্পীডের চেয়েও বেশি গতিতে ছোটে একটা থেকে আরেকটায়। অনেকবার দেখেছি। কি করে যে ঘটে ব্যাপারটা বুঝি না।'

থ্রটল পিছিয়ে বোটের নাক ঘোরাল সে. পশ্চিমদিক মুখ করা ইনলেটে ঢুকে পড়ল। দু'দিকে বেঁধে রাখা অসংখ্য ডাউর মধ্যে দিয়ে সাবধানে এগোল বোট। বেশ কয়েকটা আধা তৈরি, প্রায় তৈরি ডাউ দেখল রানা, ইনলেটের দুই তীরে উপুড় করে রাখা আছে। কোনটার আছে শুধুই কঙ্কালের মত কাঠামো। পরের কাজে হাত দেয়া হয়নি এখনও।

'এক সময় ডাউর বেশ বড় বন্দর ছিল এটা,' আবার বলে উঠল রিক ক্লে। 'আশেপাশের কেউ ডাউ কিনতে হলে এখানে আসত। এখান থেকে হাঙরসহ অন্যান্য মাছের শুঁটকি রফতানী হয় পুব আফ্রিকায়।'

একটা মূরিং পোলের সাথে বোট বাঁধল টোকিও। বোটের ডিঙি নামানো হলো পানিতে। এটাও ইনফ্লেটেব্ল্, তবে জেমিনির মত বড় নয়। বরং বেশ ছোট। অ্যাভন। রানা, ক্লে ও আতাসী ওটায় চড়ে তীরে চলল। টোকিওর সাথে দারভিশ ও জামাল থাকল বোটের নিরাপত্তার জন্যে। বাতাসে ভাসছে সীউইড আর

রান্নার মশলার ঝাঁঝ। পরেরটা বেশ কড়া। দূরে কোথাও থেকে ভেসে এল আযান।

তীরে উঠল ওরা, অ্যাভন সৈকতে তুলে রেখে পাথুরে রাস্তা ধরে এগোল। একটা সরু গলিতে ঢুকল, দু'দিকে জেলেদের ঘর। ছাগলের চামড়ার পর্দা দিয়ে জানালা ঢাকা, তার ফাঁক দিয়ে ভেতরের ছেঁড়া মশারী, নোংরা ঘর দেখা যায়। করুণ অবস্থা। মশলার ঝাঁঝ এখন বহুগুণ বেশি লাগছে। তার সাথে কাঁচা মাছের গন্ধ মিলিয়ে একেবারে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

শুকানো মাটির তৈরি দুই দেয়ালের মধ্যে ঢুকল রিক ক্লে। রানার কাঁধের চেয়ে সামান্য বেশি চওড়া হবে গলিটা, একটু এদিক-ওদিক হলে ঘষা লাগে। পিছন থেকে ডেকে উঠল আতাসী। 'বস্!'

'কি?'

'গাঁজার গন্ধ পাচ্ছি।'

নাক টানল রানা। 'হ্যাঁ। আমিও।'

গলি ছেড়ে আরেকটা খোলা রাস্তায় পড়ল। সামনে কাঁচা বাজার। প্রচুর মেয়ে কেনা-বেচা করছে। জটলাও করছে। সবার মাথায় বড় ওড়না, পরনে কালো জোব্বা। আগন্তুক দেখে তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকল সবাই। এক অল্পবয়সী তরুণের সামনে থামল ক্লে। কম্বলের পর্দা ঢাকা এক খোলা দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণধার ছুরির ডগা দিয়ে নখের ময়লা পরিষ্কার করছে সে। এখানকার একমাত্র রেস্টুরেন্টের দরজা ওটা। থুতনিতে কয়েকগোছা দাড়ি। চোখ তুলে ওদের দেখেই নিজের কাজে মন দিল ছেলেটা।

'মাসা'ইল খাইর!' হাসিমুখে বলল ক্লে।

সন্দেহের চোখে তাকাল ছেলেটা। 'মাসা 'ইন নূর!'

'আসিফ। ইজমি চায়না, টাকাকালাম্মা ইংলীযি?'

'লা,' মাথা দোলাল সে।

'কি বলে?' আতাসী জানতে চাইল।

শ্রাগ করল ক্লে। 'ইংরেজি বোঝে না।' যুবকের দিকে ফিরে এবার ভাঙা ভাঙা আরবীতে বলল, নসিব নামে একজনকে খুঁজছে সে। জেলে। লোকটা ভেতরে আছে কি না দেখে এসো। খুব জরুরী দরকার তাকে।

প্রথমে কিছুক্ষণ মনে হলো শোনেইনি ছেলেটা, ব্যস্ত। তারপর ঘুরে দাঁড়াল ধীরে সুস্থে, পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরেও এল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তা'আল।'

ঢুকে পড়ল ওরা। রেস্টুরেন্টের ভেতরটা বেশ বড়। ওপরের আড়কাঠে পিতলের কয়েকটা তেলের বাতি জ্বলছে। মেঝেতে বিছানো মলিন কার্পেটে কয়েকজন বয়স্ক লোক বসা। সিগারেটের নীলচে ধোঁয়া ভাসছে শূন্যে। দরজার দিকে মুখ করে বসা বিশালদেহী এক লোক উঠে এল ওদের দেখে। ষাটের মত হবে বয়স। রানার চাইতে কম করেও আধহাত লম্বা সে, গণ্ডারের মত দেহ। চোখের নিচ থেকে নিয়ে সারা গালে গিজগিজে কাঁচাপাকা দাড়ি। ওয়েস্টব্যান্ডে একটা খঞ্জর গোঁজা। 'মিস্টার চায়না!' গমগমে গলায় বলল লোকটা। 'আহ্লান ওয়া সাহ্লান! ওয়েলকাম, ওয়েলকাম!'

হাত মেলাল ক্লে। ইংরেজিতে বলল, 'কেমন আছেন, বন্ধু? পরিবারের সবাই ভাল তো?'

দু'হাত চিৎ করে হাসল নসিব। 'সব ভাল, আল্লাহর রহমতে,' ভাঙা ইংরেজিতে বলল। 'আপনি কেমন আছেন?'

'ভাল আছি। থ্যাঙ্কস। এঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। আমার দুই পুরনো বন্ধু, ইনি মাসুদ রানা। ইনি আতাসী।'

দীর্ঘ হ্যান্ডশেক-শুভেচ্ছা বিনিময় ইত্যাদি সেরে এক জায়গায় গোল হয়ে বসল ওরা। নসিব মেহমানদারীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রথমে এল সবুজ খেজুর ও দারুচিনিগন্ধী কফি, তার একটুপর বাদাম ও চিনি-ছাড়া লাল চা। হাবভাবে বোঝা গেল লোকটা যথেষ্ট প্রভাবশালী। তার একের পর এক হুকুম পালন করতে গিয়ে রেস্টুরেন্ট মালিক ঠিকমত দম ছাড়ার সুযোগও পাচ্ছে না। সামান্য বিরতি দিয়ে এল খাসীর কাবাব এবং আরেক প্রস্থ কফি। রানা শেষ দফা আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু চেপে যেতে হলো ক্লের খোঁচা খেয়ে। মেহমানদারীর সময় 'না' শুনলে আত্মসম্মানে লাগে নাকি এদের।

দীর্ঘ সময় পর আসল প্রসঙ্গ তুলল নসিব, জানতে চাইল ভাল বন্ধু ক্লের আসার কারণ। 'আমার এই বন্ধুর এক জাহাজ আছে,' রানাকে দেখিয়ে বলল সে। 'মালটানা জাহাজ। এদিকের কোথাও থেকে হাইজ্যাক হয়ে গেছে ওটা।'

চাউনি সতর্ক হয়ে উঠল নসিবের। 'কি মাল ছিল ওটায়?'

'কৃষি যন্ত্রপাতি,' রানা বলে উঠল।

'কবেকার ঘটনা এটা?' ভুরু কুঁচকে সার্চলাইটের দৃষ্টিতে ওদের প্রত্যেকের অভিব্যক্তি লক্ষ করছে নসিব।

'দু'সপ্তার কিছু বেশি হবে।'

'কতবড় জাহাজ? কি ধরনের?'

'মালটানা। সবুজের ওপর লাল ফ্ল্যাগওয়ালা,' কার্পেটে আঙুল দিয়ে পতাকা এঁকে কোথায় কি রং, বোঝাবার চেষ্টা করল ও।

একটু তফাতে অপেক্ষমাণ সঙ্গীদের মধ্যে থেকে ইশারায় এক বুড়োকে কাছে ডাকল নসিব। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল কিছু। হাত-মুখ নেড়ে অনেকক্ষণ ধরে তার জবাব দিল বুড়ো। উত্তেজিত। তার বলা শেষ হতে ওদের দিকে ফিরল গণ্ডার,

দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসল।

'ঘটনাটা এর মুখে আগেও একদিন শুনেছি আমি,' বলল সে। 'পাত্তা দিইনি। প্রায়ই ঘটে এমন ঘটনা। দেখেশুনে কান-চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যাই হোক, এই বুড়ো দেখেছে আপনার জাহাজ।'

লোকটাকে দেখল রানা। 'কবে? কোথায়?'

'আমি বলছি,' আবার দাড়িতে হাত বোলাল নসিব। 'সেদিন সন্ধের একটু আগে এই লোক মাছ ধরে বাড়ি ফিরছিল ডাউ নিয়ে। জাহাজটার সামনে দিয়ে আসার সময় ওটা হর্ন বাজায় একে সতর্ক করার জন্যে। তার একটুপরই ঘটে অদ্ভুত এক ঘটনা। এ অবশ্য প্রথমে ভেবেছে ভুল দেখেছে।'

'কি?'

'হঠাৎ কোত্থেকে দুই কালো রাবার বোট এসে হাজির। বো-র সাথে লম্বা লাইন বাধিয়ে জাহাজের সঙ্গে খানিকটা এগোয় ও দুটো, তারপর কালো পোশাক পরা সাত-আটজন দড়ি ছুঁড়ে মারে ওপরে, ওগুলো বেয়ে...'

রানা বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'গোলাগুলি?'

'না, গোলাগুলি হয়নি। বিনা বাধায় শিপে উঠেছে ওরা।'

'সাত-আটজন?'

উত্তর দেয়ার আগে বুড়োর সাথে কথা বলে নিল নসিব। 'হ্যাঁ।'

'তারপর? কোর্স বদল করেনি ওটা?'

'তখনও পর্যন্ত না।'

খবরের বিনিময়ে বুড়োর হাতে মোটা বকশিশ ধরিয়ে দিয়ে একটু পর উঠে পড়ল ওরা। সহযোগিতার জন্যে নসিবকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোটে ফিরে এল।

রেইডারদের সংখ্যা জানতে পেরে সন্তুষ্ট মাসুদ রানা, অনুমানে তাহলে ঠিকই আছে। ভুল হয়নি। মনের জোর বহুগুণ বেড়ে গেল।

'ল্যান্ড অ্যাপ্রোচ!' টোকিও গলা চড়িয়ে বলল হেলম থেকে।

স্টার সাইড উইং থেকে উঁকি দিল রানা। অনেক দূরে বাস সারকানের হেডল্যান্ড দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট, কাঁপা কাঁপা। আগে থেকে ঠিক করা আছে দ্বীপের বেশি কাছে যাবে না ওরা।

সময় বুঝে হাত বাড়াল জাপানী, গতি কমিয়ে দিল। একটু পর খোলা সাগরে নোঙর করল গালফ পার্ল। আর কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। বোটে মানুষ বেশি দেখলে সন্দেহ জাগতে পারে দ্বীপবাসীর, নতুন কোন গুজবের জন্ম হতে পারে। রানা সে সুযোগ দিতে চায় না। বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেয়ার ইচ্ছে নেই এ পর্যায়ে।

অ্যাভন পানিতে নামানো হলো। রানা, আতাসী আর ক্লে উঠল, গুঞ্জন ছেড়ে স্টার্ট নিল আউটবোর্ড এঞ্জিন। পাঁচ নট গতিতে রওনা হয়ে গেল দ্বীপের দিকে। দক্ষিণে রাস সারকান ও উত্তরে রাস দিল্লাহ্ রেখে প্রশস্ত খাওয়ার হাবালাইন বে ধরে গুড়-গুড় শব্দে এগিয়ে চলেছে অ্যাভন। এই বে বিশাল বিস্তৃত মুসানডেম পেনিনসুলার দক্ষিণ প্রান্ত। তীরের সাথে ক্র্যাফটের ব্যবধান দু'দিকেই দেড় মাইলের মত। যথেষ্ট। এত দূর থেকে কারও কানে পৌঁছবে না শব্দ, উত্তাপের কাঁপা ধোঁয়ার জন্যে দেখতেও পাবে না কেউ ওদের।

পুরো দু'ঘণ্টা পর তীরে পৌঁছল অ্যাভন, বে-র ওপর ঝুঁকে থাকা এক ক্লিফের নিচে থামল। এতক্ষণের অসহ্য উত্তাপের পর এই হঠাৎ ছায়া অসম্ভব ভাল লাগল সবার। একটু দূরে ছয়-সাতটা মাছ ধরা ডাউ বাঁধা। কাছেই ছোট-বড় জাল ঝুলছে ফেন্সের মত। তার ওপাশে মাটির ইঁটের কয়েকটা ঘর। ওগুলোর পিছনের

খানিকটা ফাঁকা জায়গার পর খাড়া পাস। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে একটা ট্র্যাক। ওপাশের সাথে এপাশের একমাত্র সংযোগ।

অ্যাভনের আওয়াজ শুনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বাচ্চারা, পুরুষরা। ক্রমে বড় হতে শুরু করল জটলা। 'চলো নামি,' ক্লে বলল এঞ্জিন অফ করে।

নেমে পড়ল ওরা। জটলার ভেতরের বয়স্ক একজনের দিকে এগোল। ওমানী আরবীতে তার কুশল জিজ্ঞেস করল ক্লে। লোকটা গ্রামের হেডম্যান। ঠিকমত বোঝে না ভাষাটা। গম্ভীর চেহারায় ওদের বাড়ানো হাত ধরল সে, ঝাঁকিয়ে দিল। আসার কারণ যথাসম্ভব সহজবোধ্য করে বলল ক্লে। তবু কিছু বলল না সে। সঙ্গীদের দিকে ফিরে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলল।

এক কিশোর দৌড়ে ওদের চোখের আড়ালে চলে গেল তক্ষুণি, একটু পর বিশাল বপুর একজনকে নিয়ে ফিরল। চল্লিশের বেশি বয়স হবে লোকটার, অনুমান করল রানা। সাদা চামড়া। জিনস আর চেক শার্ট পরনে। বিশাল পেট সামাল দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে শার্টের। রানার মনে হলো এই লোকই সে।

'কি চান আপনারা?' ইংরেজিতে প্রশ্ন করল লোকটা। 'এরা ওমানী, আরবী, ইংরেজি কিছুই বোঝে না।'

'আমরা মিস্টার হলম্যানকে খুঁজছি,' রানা বলল।

'তো?' গম্ভীর সে।

'আপনি?'

'নির্ভর করে আপনারা ট্যাক্স অফিস থেকে এসেছেন কি না তার ওপর।'

মুচকে হাসল ও। 'না। এসেছি মন্ত্রী আজিজ জাফরের কাছ থেকে।'

চেহারা সামান্য সদয় হলো। 'বুঝেছি। ভৌতিক জাহাজের খোঁজ জানতে?' হাত বাড়াল লোকটা। 'আমিই হলম্যান।'

'মাসুদ রানা। এরা আমার বন্ধু। রিক ক্লে, আতাসী।'

হেডম্যানের উদ্দেশে কিছু বলল লোকটা, এবং এতক্ষণে এক চিলতে হাসির আভাস ফুটল তার চেহারায়। 'আসুন আমার সাথে।'

ঘরগুলোর পিছনে এক টেন্টে নিয়ে এল ওদের হলম্যান। পথে নিজের এরকম জায়গায় পড়ে থাকার কারণ খুলে বলল। বোরিং এঞ্জিনিয়ার সে, দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে নেটিভদের জন্যে ফ্রেশওয়াটার ওয়েল খোঁড়ার কাজ করে। অনেক বছর ধরে এ দেশে আছে।

'বাড়ি যান না? ইংল্যান্ডে?' ক্লে জানতে চাইল।

'এ দেশই আমার বাড়ি, ওখানে কেউ নেই। ছুটিছাটায় ব্যাঙ্কক অথবা হংকং যাই, ব্যস্!'

টেন্টের সামনে ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসল সবাই। অন্ধকার হয়ে গেছে ততক্ষণে। আলো জ্বেলে টেন্টের দরজায় ঝোলাল লোকটা, সামনের স্থায়ী এক পিটে আগুন তৈরি করল। 'হেডম্যানকে তাজা মাছ দিয়ে যেতে বলেছি,' কাজের ফাঁকে বলল সে। 'রাতে খেয়ে যাবেন আপনারা।'

একটু পর বেশ কয়েকটা বড় মাছ নিয়ে এল এক যুবক। ওগুলো পরিষ্কার করে একেকবারে দুটো করে শিকে গেঁথে পিটের ওপর ঝুলিয়ে দিল হলম্যান। তারা জ্বলা আকাশের নিচে বসে বারবিকিউ করা মাছ দিয়ে ডিনার খেল ওরা। সে রাতের কথা ভুলতে পারবে না কেউ। কথা বলে বোঝা গেল জাফর আজিজ রানাকে যা বলেছেন, তা ছিল খবরের একটা অংশ মাত্র। আরও আছে।

'জেলেদের মুখে শুনেছি,' বলল হলম্যান। 'যে ইনলেটে ঢুকে

উধাও হয়ে গিয়েছিল জাহাজটা, কয়েক রাত আগে ওটার মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে। হঠাৎ করে কয়েকটা শক্তিশালী আলো জ্বলে উঠতে দেখেছে ওরা সেখানে, সাগরের তলা থেকে মেঘ ডাকার মত বেশ কয়েকটা আওয়াজও হয়েছে। ভয়ে পালিয়ে আসে ওরা।

'পরদিন সকালে সাহস করে কেউ কেউ গিয়েছিল ব্যাপার দেখতে। তখনও ফাঁকা দেখেছে ওরা ভেতরটা। তবে ইনলেটের পানিতে হাজার হাজার মরা মাছ ভাসছিল। জালে বা বড়শিতে মরেছে, এমন কোন চিহ্ন নেই। কোন অসুখের লক্ষণও দেখা যায়নি। ব্যস্, গুজবের বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বেড়ে গেল। জেলেরা সেটাকে ভৌতিক বলে পুরোপুরি মেনে নিল।'

'জায়গাটা কোথায় এরা দেখিয়ে দিতে পারবে আমাদের?' প্রশ্ন করল রানা।

হেডম্যানের সাথে কথা বলে মাথা ঝাঁকাল এঞ্জিনিয়ার। 'হ্যাঁ।'

হঠাৎ পানির দিক থেকে উত্তেজিত চ্যাঁচামেচির শব্দ ভেসে আসতে উঠে পড়ল সবাই। কয়েকজনকে আলো হাতে সৈকতে ছোটাছুটি করতে দেখা গেল, সবাই উত্তেজিত। আলোয় একটা মাছ ধরা ক্যানো দেখল রানা। দু'জন দাঁড়িয়ে আছে ওটায়, হাত মুখ নেড়ে তীরের জটলার উদ্দেশে কিছু বলছে।

কেউ চেঁচিয়ে ডাকল হেডম্যানকে, হুড়মুড় করে ছুটে গেল সে। এদিকে অবিশ্বাসে চোখ বড় হয়ে উঠেছে এঞ্জিনিয়ারের।

'কি ঘটছে?' প্রশ্ন করল রানা।

চেহারা বিকৃত করল সে। 'যা শুনলাম তা বিশ্বাস হয় না। অবশ্য এদের ভাষাও পুরো বুঝি না আমি, হয়তো ভুলই শুনেছি। চলুন, দেখে আসি।'

দ্রুত এগোল ওরা। ভিড় ঠেলে পানির কিনারায় দাঁড়াল।

ক্যানোর দুই জেলে হাঁটু পানিতে নেমে জাল টানছে। টান্ টান্ হয়ে আছে জাল, ভারী কিছু একটা আটকেছে। জিনিসটা ফ্যাকাসে। উঠে এল। চাপা গুঞ্জন উঠল। একটু সময় লাগল ওদের আকারহীন জিনিসটা চিনে উঠতে।

'বেচারা!' বিড়বিড় করে বলল এঞ্জিনিয়ার। 'নিশ্চই হাঙরের কাজ। তাহলে ভুল শুনিনি তখন।' আরেকটু এগিয়ে দেখল। 'আরব নয়।'

ঝুঁকে দেহটা দেখল মাসুদ রানা। কাঁধ আর বুকের একটা অংশ নেই। পচে ফুলে উঠেছে, মাংস খসে পড়েছে কয়েক জায়গা থেকে। কলাগাছের মত মোটা বাঁ হাতের আঙুলে কিছু একটা চক্ চক্ করে উঠল আলো লেগে। আংটি হয়তো।

'এই অঞ্চলে হাঙরের আক্রমণে কেউ মরেছে বলে শুনিনি,' ক্লে বলল বিড়বিড় করে। 'এই প্রথম।'

হাত বাড়িয়ে দেহটার পেট স্পর্শ করল রানা। তেলতেলে, ঘন কি যেন আঙুলে লাগল। আঙুল আলোর সামনে ধরে দেখল। 'গ্রীজ!'

'বেশ ঘন,' ক্লে মন্তব্য করল। 'জাহাজের গ্রীজ নাকি?'

রানা-আতাসীর চোখাচোখি হলো। লাশের অক্ষত হাতটা তুলে নিল রানা, আলো ধরে আংটিতে কিছু লেখা আছে কি না খুঁজল। আছে! ভুরু কুঁচকে অনেক কষ্টে পড়ল লেখাটা. প্রিয়তম হাসানকে মিমি।

'হাসান!' ক্লে বলল। 'কে···?'

ঢাকা থেকে নিয়ে আসা বাংলার গৌরবের স্টাফ লিস্টটার কথা খেয়াল হলো রানার। এই নাম দেখেছে ও তাতে। ফখরুল হাসান—ফার্স্ট অফিসার।

'লোকটা মনে হয় সাঁতরে পালাতে চেষ্টা করেছিল, বস্,' নিচু

গলায় বলল আতাসী। 'হাঙরের মুখে পড়ে এই হাল হয়েছে।'

গম্ভীর, থমথমে চেহারায় মাথা দোলাল ও। 'পড়েনি। হাঙর ডেকে এনে তার মুখে ফেলা হয়েছে।'

'মানে?'

'সাগরের তলা থেকে মেঘ ডাকার মত যে আওয়াজ উঠেছিল, গ্রেনেডের ছিল তা। পানিতে গ্রেনেড ফেলেছে ওরা একে ধরতে না পেরে, বিস্ফোরণের ধাক্কায় মরা মাছ খেতে হাঙর এসে...'

'বুঝেছি। তার মানে মানুষটা পালাচ্ছিল।'

জবাব দিল না রানা। অন্ধকার সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, 'ধারেকাছেই কোথাও আছে ওটা।'

লোকালয়ের একটু দূরে, শক্ত মাটি খুঁড়ে কোনরকমে কবর দেয়া হলো ফখরুল হাসানকে–দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে শেষ আশ্রয় জুটল তার, তারই চিরকালের পবিত্র ভূমিতে। মাথার কাছে একটা খেজুর গাছ কবরের প্রহরী হয়ে রইল। প্রচণ্ড গরমের সময় কিছুটা ছায়া দেবে। হয়তো পথ ভোলা কোন পাখি কখনও এসে বসবে ওটার ডালে, মাঝেমধ্যে মিষ্টি সুরে গান শোনাবে একদম একা, নির্বান্ধব পরিবেশে অনন্তনিদ্রায় শুয়ে থাকা মানুষটিকে।

হাত দিয়ে কবরের মাটি যথাসম্ভব সমান করে দিল মাসুদ রানা, বুকে চাপা একটা ব্যথা নিয়ে উঠে পড়ল। আতাসী উঠল দেরিতে। মাটি ছুঁয়ে বিড় বিড় করে বলল সে, 'তোমার মৃত্যু বৃথা যেতে পারে না, বন্ধু। আমরা এর প্রতিশোধ নেব। স্বাধীন প্যালেস্টাইনের ইতিহাসে তোমার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে জেনো।'

অন্ধকার থাকতে রওনা হলো ওরা ডাউ নিয়ে। এবার মাসুদ রানা, দারভিশ হামাম ও রিক ক্লে। হেডম্যানের কাছ থেকে ধার করা জেলেদের পোশাক পরে আছে ওরা, মাথায় হেডড্রেস বা দিশদাশা। পরের ঘটনার রাতে যারা জায়গাটার কাছে ছিল, তাদের একজন চালাচ্ছে ডাউ।

ঘণ্টা দুয়েক লাগল পৌঁছতে। তবে ভেতরে ঢুকল না রানা, মাছ ধরার অভিনয়ের ফাঁকে ইনলেটের চওড়া মুখের কাছে কয়েকটা চক্কর দিল। এখান থেকে ভেতরের পুরোটা দেখা না গেলেও ভেতরের পরিধি মোটামুটি আন্দাজ করে নিল ওরা। অবশ্য দুই স্কয়ার মাইলের মত জায়গা আড়ালের জন্যে অদেখাই রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। উপায় নেই, দেখতে হলে ভেতরে যেতে হয়।

বাংলার গৌরবের মত বড় এক ফ্রেইটার অনায়াসে লুকিয়ে রাখা সম্ভব ভেতরের আড়ালে, ভাবল রানা। কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনও কি আছে ওটা? নাকি ফখরুল হাসানের পালানোর চেষ্টার পর সরে পড়েছে ওদের অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে ভেবে? প্রশ্নটা মন থেকে তাড়াতে পারল না। বোটে ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেল।

খাওয়ার পর বসল মীটিং। 'রাতে আমি ইনলেটের ভেতর ঢুকব,' ঘোষণা করল রানা। 'আরেকজন চাই। ক্লে চাইলে আসতে পারো।'

'অবশ্যই!' বলে উঠল সে।

স্ফিংসের চেহারায় আবছা অসন্তোষ ফুটতে দেখা গেল। কিন্তু এ ধরনের মিশনে কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশের বাইরে যাওয়ার যে উপায় নেই, লোকটা তা ভালই জানে। তাই নিজের যাওয়ার ইচ্ছের কথা চেপে গেল। খেয়াল করল রানা ব্যাপারটা। 'সার্জেন্ট,'

মৃদু গলায় বলল। 'যুদ্ধটা আমাদের, এদের নয়,' ক্লেকে দেখাল। 'এরা ভলান্টিয়ার। প্রথমে শুধু ভেতরটা দেখে আসতে যাব বলেই এ প্রস্তাব দিয়েছি আমি। তোমার অসন্তুষ্ট হওয়ার বোধহয় কিছু নেই এরমধ্যে।'

মানুষটা নিশ্চই চেহারা দেখে মনের কথা পড়তে পারে, ভাবল দারভিশ। 'আমি অসন্তুষ্ট হইনি, স্যার।'

'ভেরি গুড।' সিগারেট ধরাল রানা। 'এবার প্রস্তুতি প্রসঙ্গ।'

ঠিক হলো দুই ওয়াটার স্কূটার নিয়ে যাবে ওরা। ইনলেটের মুখের কাছে কোথাও ওগুলো রেখে সাঁতরে ভেতরে ঢুকবে। জাহাজটা আছে কি না দেখে ফিরে আসবে। যদি থাকে, তাহলে পরের চিন্তা বোটে ফিরে এঁসে করবে।

'আত্মরক্ষার জন্যে সঙ্গে কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত তোমাদের, বস্,' আতাসী মন্তব্য করল।

'আগ্নেয়াস্ত্র নিচ্ছি না,' বলল রানা। 'তবে পানির নিচে ব্যবহারের উপযুক্ত অস্ত্র সঙ্গে থাকবে অবশ্যই। ক্লের সেসবের মজুত আছে।'

লকার থেকে বের করা হলো জিনিসগুলো। ওর একটা ভয়ঙ্কর চেহারার 'শার্কস্টিক'। চারফুট লম্বা, বন্দুকের মত দেখতে অনেকটা। ভোঁতা মাথা। জিনিসটা সময়মত হাঙরের পেটে ঠেকালে হলো, স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিলিজ হয়ে যাবে কমপ্রেশড্ স্প্রিং, নল দিয়ে ১২ বোর শটগানের তুলনায় দ্বিগুণ শক্তিশালী বুলেট ছুটবে। ফল হবে মারাত্মক। শিকার মানুষ হলে শরীরে কুয়োর মত গর্ত করে বেরিয়ে যাবে।

এরপর একজোড়া গার্বার 'নেপচুন' ডাইভিং নাইফ। স্টেইনলেস স্টীলের ছুরি, দু'মুখো। একদিকে দড়ি কাটার জন্যে করাতের মত খাঁজ কাটা। অবিশ্বাস্য তীক্ষ্ণ ধার। একজোড়া

বুচার'স গ্লাভস বের করল ক্লে। উভেন স্টেইনলেস স্টীল ও কেভলার ২৯ এর তৈরি। ও জিনিস পরা থাকলে ধারাল কোরাল মুঠো করে ধরা যাবে, শত্রুর ফাইটিঙ নাইফের ব্লেডও। সবশেষে সাধারণ হার্পুন গান।

দিনের বাকি সময় স্কুবা ডাইভিঙ ইকুইপমেন্ট আর ওয়াটার স্কূটার জেট রেইডার পরীক্ষার পিছনে ব্যয় করল ওরা।

মাঝরাতে আসল কাজে হাত দিল রানা, ধীরেসুস্থে পরল ডাইভারের কালো রাবার স্যুট। স্ট্যাব জ্যাকেট সঙ্গে থাকল, পরে পরবে। জিনিসটা ইনফ্লেটেব্‌ল্ ওয়েস্টকোট। পানির নিচে ডাইভারকে প্রয়োজনীয় গভীরতায় স্থির রাখা ওটার কাজ। ব্যাকপ্যাক হার্নেস আছে জ্যাকেটের সাথে–স্কুবা ট্যাঙ্ক, মাস্ক, ওয়েস্টবেল্ট আর অক্টোপাসের শুঁড়ের মত এয়ারপাইপ ইত্যাদি থাকে ওর মধ্যে। চোখে লাগাল নাইটভিশন।

পুরো রেডি হয়ে ডেকে বেরিয়ে এল রানা ও ক্লে। দারভিশ ও টোকিও জেট রেইডার, শার্কস্টিক ও হার্পুন নিয়ে অপেক্ষা করছে। সঙ্গীর সাথে ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিল রানা। 'সময় নিয়ে কাজ সারব আমরা,' সবার উদ্দেশে বলল। 'কাজেই দেরি দেখলে কেউ আতঙ্কিত হয়ো না। ভোর পাঁচটার দিকে ফিরব আমরা আশা করছি। যদি কঠিন সমস্যায় পড়ি, লাল ফ্লেয়ার ছুঁড়ব, দেরি না করে চলে এসো।'

'শিওর!' বলল আতাসী। 'সতর্ক থেকো, বস্।'

মাথা ঝাঁকাল ও, নাইটভিশন ওপরে তুলে রেখে ল্যাডারের দিকে এগোল। পানিতে মৃদু ঢেউয়ে দুলছে দুই স্কূটার। উঠে বসে শেষ মুহূর্তের পরীক্ষা সেরে নিয়ে স্টার্ট দিল। ফোয়ারা যেমন আওয়াজ করে, ঠিক তেমনি চাপা, মসৃণ আওয়াজ উঠল। কান খাড়া করেও বোঝা কঠিন ওটা কিসের আওয়াজ। ওপরে রেলিং

ধরে দাঁড়ানো সবার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা, তারপর বাঁধন খুলে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে। এক মুহূর্ত পর গেল রিক ক্লে। নিঃশব্দে। আড়াই নট গতিতে এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে।

টানা এক ঘণ্টা ছুটে জায়গামত পৌঁছল ওরা। সকালে যে জায়গাটা পছন্দ করে রেখে গেছে রানা, সেখানে থেমে অফ করে দিল মোটর। ইনলেটের আধমাইল দূরের একটা পাথুরে টিলা ওটা, বিচ্ছিন্ন। বড় এক বোল্ডারের আড়ালে নেমে পানির গভীরতা পরীক্ষা করে দেখল ক্লে। পাঁচ ফুট–যথেষ্ট। উঠে বুড়ো আঙুল দেখাল। দড়ি দিয়ে বোল্ডারের সাথে স্কুটার বাঁধল ওরা। বয়ান্সি ট্যাঙ্ক খুলে দিতে পানিতে ভরে গেল ওগুলোর পেট, আস্তে করে তলিয়ে গেল। নিশ্চিন্ত। কারও দেখে ফেলার ভয় নেই।

যে যার নাইটভিশন জায়গামত বসিয়ে সামনে তাকাল। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আধঘণ্টা ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও প্রাণের সাড়া দেখল না ওরা ইনলেটের ভেতরে। মানুষ আছে ওখানে, তেমন কোন চিহ্নই নেই, ১৫ হাজার টনী এক ফ্রেইটার তো অনেক পরের কথা। বিশ্বাসে চিড় ধরতে শুরু করল রানার। ওটা নেই ভেতরে, ভাবতে শুরু করল। নিশ্চই ফখরুল হাসান পালাতে চেষ্টা করার পর সরে পড়েছে। আলো আর গ্রেনেডের আওয়াজ যে কাছেপিঠের জেলেরা টের পেয়ে গেছে, তা বোঝার মত বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে ওদের। হয়তো ওই ঘটনার পরই সরে পড়েছে।

নাকি আছে?

'কি মনে হয়, রানা?' বলল ক্লে।

অসহায় ভঙ্গি করল ও। 'ব্যাপারটা পণ্ডশ্রম হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না। তোমার কি ধারণা?'

'ধারণা-টারনার দরকার কি?' হাসল সে। হাত তুলে ইনলেট

দেখাল। 'এই তো, ঘুরে এলেই হয় একবার।'

'ঠিক বলেছ, আমিও তাই ভাবছি। এতদূর থেকে নাইটভিশনও ঠিকমত কাজ করছে না। চলো তাহলে।'

বোল্ডারের ওপর রাখা স্ট্যাব জ্যাকেট পরে নিল ওরা। নেমে পড়ল পানিতে। জাহাজ থাকার সম্ভাবনা কম ভেবে একটা করে শার্ক স্টিক–হার্পুন গান রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। সাঁতারে সুবিধে হবে তাতে। দ্রুত এগোনো যাবে। পনেরো মিনিট সাঁতরে ইনলেটের মুখ সোজা খানিক দূরের আরেক পাথরের এবড়োখেবড়ো স্তম্ভের গোড়ায় থামল ওরা। এখান থেকে ভেতরের পুরোটা খোলামেলা। দিন হলে দেখা যেত, এখন শুধুই গাঢ় অন্ধকার। নাইটভিশনও কোন কাজে আসছে না। ক্লিফের খাড়া দেয়াল পর্দা হয়ে ঢেকে রেখেছে ভেতরের রহস্যময় জগৎ। দশ মিটারের ওপাশে নজর চলে না।

পাশাপাশি আবার এগোল রানা-ক্লে। বেশ খানিকটা ভেতরে ঢুকে সাবধানে মাথা তুলল, পাথরের কর্কশ দেয়াল ধরে স্থির হলো। সামনে খাড়া খাড়া অসংখ্য ক্লিফ আর শেলফ। কোথাও বিশাল গাড়ি বারান্দার মত পানির ওপর ঝুঁকে আছে পাথর, কোথাও ঝুঁকতে গিয়েও মোচড় খেয়ে উঠে গেছে ওপরদিকে। সব মিলিয়ে আজব এক ভুবন।

অন্য সময়, অন্য পরিস্থিতি হলে এখানকার নাটকীয় ভৌগলিক চেহারা হয়তো মুগ্ধ করত দুই নিশাচরকে, কিন্তু এ মুহূর্তে করল না। বরং করল উল্টো। সামনের অসংখ্য খাড়া পাথরের স্তম্ভের যে কোন একটা যে বাংলার গৌরবের বো হওয়া বিচিত্র নয়, ভাবনাটা উদ্বেগে ফেলে দিয়েছে ওদের। ক্ষীণ চাঁদের যে সামান্য আলো, তাতে কিছুই নিশ্চিত করে বোঝার উপায় নেই।

মুখ থেকে রেগুলেটর মাউথপীস বের করল রানা। ক্লের কাঁধে

টোকা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কি মনে হয়?'

'যদি ক্যামো ড্রেপস্ দিয়ে ঢাকা থাকে, তাহলে থাকার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। তীর থেকে অন্তত আধমাইল তফাতে আছে ওটা থেকে থাকলে। তীরের পানির গভীরতা কম।'

'তুমি থাকো এখানে, আমি দেখে আসি।'

রেগে উঠল ক্লে। 'মানে! এতদূর এলাম কি বসে থাকব বলে?'

'দু'জনে যাওয়ার চেয়ে ফাইন্যাল লেগে একজনের যাওয়াই ভাল,' বোঝাতে চেষ্টা করল রানা।

'তাহলে তুমি থেকে যাও না কেন? আফটার অল, এই অঞ্চলের পানিতে কাজ করে আমি অভ্যস্ত, তুমি নও।'

হার মানল ও। 'আচ্ছা, বেশ। চলো দু'জনই যাই।'

ঠিক হলো যতদূর সম্ভব নিচ দিয়ে এগোবে ওরা, সতর্ক নজর রাখবে পরস্পরের ওপর। একজন বিপদে পড়লে অন্যজন তক্ষুণি সরে পড়বে, সাহায্য করতে গিয়ে সময় নষ্ট করবে না। বিপদের খবর সময়মত অন্যদের জানানো না গেলে পুরো ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে পড়বে।

শার্ক স্টিক থাকল ক্লের হাতে, রানার হাতে হার্পুন গান। স্ট্যাব জ্যাকেটের বাতাস বের করে দিতে চুপ্সে গেল জিনিসটা। কোমরে বাঁধা সীসার ওয়েটবেল্টের ভারে তলিয়ে গেল দু'জনে। ধীরে ধীরে নামছে। খানিক পর পর থামছে, মুহূর্তের জন্যে দম আটকে রেখে জোরে নাক ঝাড়া দিয়ে কানের পর্দায় পানির চাপ সইয়ে নিচ্ছে। কাজটা কয়েকবার করল ওরা। এরমধ্যে নেমে পড়েছে অনেকটা, একটু পর শক্ত পাথর ঠেকল পায়ের তলায়। ডানে ইনলেটের শ্যাওলা ঢাকা দেয়াল আবছা দেখা যায়। বাঁয়ে ক্রমে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে মেঝে, ইনলেটের মাঝখানের সবচেয়ে গভীরে।

ডেপথ গজ পরীক্ষা করল মাসুদ রানা। পনেরো মিটার। পাশে দাঁড়ানো ক্লের দিকে ফিরল, মাস্কের ওপাশে দাঁত দেখা গেল লোকটার। বুড়ো আঙুল তুলে 'ওকে' সঙ্কেত দিল। মাথা ঝাঁকাল ও। জ্যাকেটে খানিকটা বাতাস ভরে নিল নিউট্রাল বয়াসির জন্যে। এর ফলে দেহ মেঝের খানিকটা ওপরে আপনাআপনি একভাবে ভেসে থাকবে, ওঠানামা করবে না।

আস্তে আস্তে ফিন দিয়ে পানিতে বাড়ি মারতে লাগল ওরা, ডান হাতে শার্ক স্টিক ও হার্পুন গান তৈরি। কিন্তু কিসের জন্যে তৈরি, কোন সমস্যার মোকাবিলায়, জানে না। বাংলার গৌরব এখানে আছে, নিজেকে এখনও ঠিক বিশ্বাস করাতে পারছে না রানা। যদি থেকেও থাকে, অবাঞ্ছিত কাউকে ঠেকাতে বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিনতাইকারীরা করেছে কি? মনে হয় না। যে বাজ পড়া জায়গা, এখানে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার যে প্রয়োজন নেই, তা এতদিনে বুঝে ফেলেছে ওরা।

কিন্তু ওর অনুমান যে কতবড় ভুল, একটুপরই তা টের পাওয়া গেল।

কখন যে রিক ক্লে ওকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, চিন্তায় ডুবে ছিল বলে টের পায়নি। কম করেও ফুট দশেক এগিয়ে আছে লোকটা। সে-ই প্রথম মাথার ওপরের বিশাল কালো কাঠামোটার অবস্থান টের পেল। মুখ তুলে ওপরে তাকাল। হ্যাঁ! ওই তো! আনন্দের আতিশয্যে বিপদের কথা বেমালুম ভুলে আরও তাড়াতাড়ি এগোল সে, ওটা সত্যি জাহাজ, না অপটিক্যাল ইলিউশন, নিশ্চিত হতে চায়।

না, সত্যি। পানিতে ফিনের জোর কয়েকটা বাড়ি মেরে দ্রুত এগোল ক্লে। খুদে মাছের বিশাল একটা ঝাঁক ভয় পেয়ে সাঁৎ করে ভাগ হয়ে গেল মাঝখান থেকে, পথ করে দিল আজব মাছটাকে।

কোনও দিকে খেয়াল নেই ডাইভারের, আবিষ্কারের আনন্দে এতই বিভোর। বিপদ যখন টের পেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। জাহাজের চারদিকে পেতে রাখা মাকড়সার জালের মত প্রায় অদৃশ্য মনোফিলামেন্ট নেটের ফাঁস গলে ঢুকে গেল তার শার্ক স্টিকের সরু মাথা, পরক্ষণে ফায়ারিঙ মেকানিজমের সাথে জড়িয়ে গেল নেট। আটকে গেল নিজেও। কি ঘটছে বুঝতে না পেরে মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল রিক ক্লে।

পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল, তাও হলো না। রাবারের নরম হোস অক্টোপাসের শুঁড়ের মত নেটে জড়িয়ে গেছে, মাউথপীসও খসে পড়ার অবস্থা। বুক কেঁপে উঠল, ব্রিটিশ স্পেশাল বোট সার্ভিসের সর্বোচ্চ ট্রেনিং পাওয়া ফ্রগম্যান সে, ভুলে গেল সে কথা। ভুলে গেল বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখার শিক্ষা। স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক জোরে দম নিতে শুরু করল। বড় বড় বুদ্বুদ উঠছে, সে খেয়াল নেই।

একটু পর সামলে নিয়ে ওপরে তাকিয়ে বাধাটা কিসের বোঝার চেষ্টা করল। জালটা চোখে পড়ল। প্রায় স্বচ্ছ মনোফিলামেন্ট জালের খানিকটা আলোড়িত পানিতে দোল খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে তার চোখের সামনে মুহূর্তের জন্যে থেমে দাঁড়াল, তারপর আবার নাচতে নাচতে মিলিয়ে গেল। বোকামির জন্যে নিজেকে কষে কয়েকটা জঘন্য গাল দিল ক্লে, রানাকে সতর্ক করার জন্যে ঘুরে তাকাল। নেই ও। চোখে পড়ছে না।

মাকড়সার জালে আটকে পড়া মাছির মত অসহায় অবস্থায় ঝুলে থাকল সে। ভয়ের প্রাথমিক ধাক্কা কেটে যেতে একটু সুস্থির হলো, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্বুদের আকার ছোট হতে হতে প্রায় বিন্দু হয়ে এল। পা তুলল সে,

গোড়ালিতে বাঁধা খাপ থেকে বের করে আনল ডবল ব্লেডের গার্বার ছুরি।

নেট চোখে পড়ছে না, কাজেই অন্ধের মত চালাল সে ওটা। কেউ দেখলে স্রেফ আহাম্মক ভাবত ওকে অনর্থক পানি কাটছে ভেবে। তবে কাজ হচ্ছে ঠিকই, ক্ষুরধার ছুরির প্রতিটা পোচই লাগছে জায়গামত। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে নেট, আঁটসাঁট বাঁধন ক্রমে ঢিলে হয়ে আসছে। কিন্তু হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল তার হাতের নড়াচড়া, আরেক অদৃশ্য জালে ধরা পড়েছে ওটাও। আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল ক্লে, ঢিলে হয়ে আসা নেটের ফাঁস থেকে নিজেকে খালি হাতেই ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। টান খেয়ে ওপরে ভেসে থাকা একটা কর্ক বয়া যে হাবুডুবু খাচ্ছে, জানার উপায় নেই তার। আরও অনেক কিছুই ঘটছে যার কোনটাই বোঝার উপায় নেই ওদের।

নিজের পিঠের স্কুবা সিলিন্ডারে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ করল রানা ছুরি দিয়ে, ক্লেকে সতর্ক করার জন্যে। অসহ্য নীরবতার মাঝে আওয়াজটা ভয়ঙ্কর অশুভ শোনাল। পিছনে ঘুরল ক্লে, মাস্কের মধ্যে ঘামছে ভীষণভাবে। রানার তর্জনী অনুসরণ করে ওপরে তাকাল, ঠিক তখনই কেউ একজন একটা সাদাটে ফসফরেসেন্ট ছাতা মেলল ইনলেটের সারফেসে।

ইসরাইলী ফ্রগম্যান! ওয়াচ বোট থেকে ঝাঁপ দিয়েছে একজন পানিতে। পরক্ষণে আরেকজন। মরিয়া হয়ে উঠল ক্লে, পাগলের মত ছুরি চালাতে লাগল। বহু কষ্টে ডানহাত ছাড়াল সে, কিন্তু বোকামির মূল্য হিসেবে শার্ক স্টিকটা বিসর্জন দিতে হলো। ছুরি বাগিয়ে ঘুরল শত্রুর মোকাবিলা করতে। এখন কেবল হোস আটকে আছে।

ওদিকে বিপদ বুঝে দূর থেকেই হার্পুন তুলল রানা, কোমরের

পাশে ধরে ট্রিগার টেনে দিল। হুশ্‌শ্‌ করে ক্লের দু'হাত দূর দিয়ে ছুটে গেল লেজে লাইন বাঁধা খুদে বর্শা, সোজা গিয়ে ঢুকল প্রথম ফ্রগম্যানের ডান চোখের গভীরে। ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেল লোকটার মাথা, হাতে যা ছিল সব ছেড়ে দু'হাতে থাবা দিয়ে চোখ চেপে ধরল সে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে একের পর এক ডিগবাজি খেতে থাকল পিছনদিকে। একটু নিচে তার কমান্ডো ছুরিও ডিগবাজি খাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে।

লোকটার যন্ত্রণার গভীরতা আন্দাজ করে গাল কুঁচকে উঠল রানার। ওদিকে ক্লের দিকে এগোল দ্বিতীয় ফ্রগম্যান। সতর্ক, প্রস্তুত। প্রতিটি মুভমেন্টে পেশাদারীর আত্মবিশ্বাস। ডান হাতে সাত ইঞ্চি লম্বা ডবল ব্লেড পিউমা ছুরি, হাতলে D-র মত হ্যান্ডগ্রিপ। বিশেষ ব্যস্ততা নেই লোকটার মধ্যে। হার্পুন ওয়ান-শট অস্ত্র, জানে সে। তাই রানাকে আপাতত হিসেবে ধরছে না। ও পৌঁছার আগেই যে হাতের কাজ সেরে ফেলতে পারবে, সে আস্থা আছে।

তৈরি হয়ে নিল রিক ক্লে। দেরিতে হলেও ট্রেনিঙের শিক্ষা এখন মনে করতে পারছে একটু একটু। পানির নিচে লড়াই করে জয়ী হওয়ার একটাই উপায়, জানে সে, তা হচ্ছে পিছন থেকে অতর্কিতে শত্রুকে আক্রমণ করা। চুল ধরে ফেস মাস্ক খুলে ফেলতে হবে তার যাতে এয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায়, দম নিতে না পারে শত্রু। তারপর বিজয় কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু এখন সে উপায় নেই।

ক্লের মুখোমুখি হলো ফ্রগম্যান। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল দুজনে। প্রথম ডাইভার তখন নেতিয়ে পড়েছে, স্ট্যাব জ্যাকেট বাতাস শূন্য বলে বেল্টের ভারে তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। এগিয়ে এল শত্রু, হাতের ছুরি ভয়ঙ্কর বেগে চালাল

ক্লের কিডনি সই করে। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল সে, কিন্তু পিছনের জালের জন্যে বেশি সরতে পারল না। একই সাথে হাতের গার্বার চালাল সে-ও, শত্রুর সিলিন্ডারে লেগে ঠং শব্দ তুলল ওটা।

ফের ছুরি চালাল কমান্ডো, পরমুহূর্তে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়ে ক্লের মাউথপীস মুঠো করে ধরার চেষ্টা করল। হাত চালাল ও ঝট্ করে, লোকটার হাতের উল্টোপিঠের চামড়া-মাংস হাঁ হয়ে হাড় বেরিয়ে গেল। নীরবে চ্যাঁচাল সে, একদলা বুদ্বুদ ছুটে গেল ওপরদিকে। রাগে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আবার হাত ছুঁড়ল লোকটা, খপ্ করে বুচার'স গ্লাভস দিয়ে ওটার ব্লেডের গোড়া চেপে ধরল ক্লে। জিনিসটা চিনতে পেরে শত্রুর চোখে ভীতি ফুটল। সুযোগ বুঝে তার এয়ারহোস সই করে গার্বার চালাল ক্লে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা দিল পানি, চওড়া ব্লেড পানিতে এঁকেবেঁকে হোসের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

প্রাণপণে যুঝছে রিক ক্লে, কিন্তু এরমধ্যেও বাঁ পাঁজরের ব্যথা সম্পর্কে সজাগ। প্রথমবার যখন ছুরি ছুঁড়েছিল ফ্রগম্যান, আঘাতটা তখনকার। ধোঁয়ার মত রক্ত বের হচ্ছে ওখান থেকে। ক্রমে বেড়ে চলেছে ব্যথা। একটু একটু করে নিস্তেজ হয়ে আসছে হাত-পা। মুঠোয় ধরা পিউমার ডগা সামলে রাখতে পারছে না, ফ্রগম্যানের প্রচণ্ড চাপে একটু একটু করে পেটের দিকে এগিয়ে আসছে। যে কোন মুহূর্তে রাবার স্যুট ভেদ করে ঢুকে যাবে তারপর...

এমন চরম মুহূর্তে পৌঁছল রানা, কাঁধ দিয়ে ব্যারাকুডার গতি আর শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর পিঠের ওপর। পলকে লড়াই শেষ হয়ে গেল। বাঁ হাতে লোকটার চুল মুঠো করে ধরল ও প্রথম চোটে, আরেক হাতে মাস্কের লেয়ার রিম ধরে ঝাঁকি দিয়ে মাথা টেনে আনল পিছনদিকে, পরমুহূর্তে গার্বারের সংক্ষিপ্ত এক হ্যাঁচকা

পোচে গলা দু'ফাঁক করে দিল তার।

ব্যাঙের ছাতার মত কালো ধোঁয়া আর বুদ্বুদ বেরিয়ে ওপরদিকে ছুটল। এবার চুল ছেড়ে তার স্ট্যাব জ্যাকেটের ইনফ্লেট বাটন টিপে দিল রানা। মুহূর্তে ফুলে ঢোল হয়ে উঠল ওটা, রকেটের বেগে সারফেসের দিকে ছুটে গেল ফ্রগম্যানের নেতিয়ে পড়া দেহ।

কাজ সেরে ক্লের দিকে মন দিল ও, এগিয়ে এসে নেট কাটতে শুরু করল ব্যস্ত হাতে। স্বস্তির ঝিরঝিরে ধারা বয়ে গেল রিকের দেহমনে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হলো না তা, আতঙ্কে হাত-পা জমে এল। রানার পিছনে, ওপর থেকে নেমে আসছে আরও দুই ফ্রগম্যান। হাত নেড়ে রানাকে সরে পড়তে বলল রিক, পাত্তা দিল না ও, আরও ব্যস্ত হয়ে নেট কাটতে থাকল। কিন্তু কাজ হচ্ছে না কিছুই, যত কাটে, ততই আরও পেঁচিয়ে যায় রিক। ওদিকে ক্রমেই কাছে চলে আসছে দুই ফ্রগম্যান। স্পীয়ার গান রয়েছে ওদের হাতে।

ওপরটা হঠাৎ করে আলো হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে থমকে গেল রানা। সার্চলাইট জ্বেলে দিয়েছে ওরা। আলোয় সারফেসে ভাসমান দুটো ইনফ্লেটেবল জেমিনি দেখা যাচ্ছে। রিক ক্লে ওদিকে প্রাণপণে চিৎকার করছে, 'রানা, পালাও! রানা, জলদি পালাও!!' একই সাথে উন্মত্তের মত হাত-পা ছুঁড়ছে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে।

হাল ছেড়ে দিল ও উপায় নেই দেখে। একবার পিছনে তাকাল কাঁধের ওপর দিয়ে। এসে পড়েছে ওরা। শেষবারের মত বন্ধুর দিকে তাকাল রানা অসহায়ের দৃষ্টিতে, তারপর চকিতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। ওপর থেকে হার্পুন ছুঁড়ল এক ফ্রগম্যান, আলোয় ঝিকিয়ে উঠল চকচকে স্পীয়ার, কিন্তু রানাকে খুঁজে পেল না ওটা। ওকে তাড়া করতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে থেমে পড়ল লোক দুটো,

খেয়াল পড়েছে নেটের ঘেরাওর মধ্যে রয়েছে তারা, এগোতে গেলে আটকে যাবে নিজেরাও।

কাজেই রানাকে ছেড়ে ক্লের দিকে মন দিল। ছুরি ছেড়ে দিল ক্লে, ধীরে ধীরে দু'হাত মাথার ওপর তুলল। কাছে চলে এল ওরা। একজন স্পীয়ার গান তুলে পাহারায় থাকল, অন্যজন সার্চ করল তাকে। একটা ডাইভার'স ছুরি পাওয়া গেল কেবল। ওটা ছেড়ে দিয়ে জাল কাটতে শুরু করল সে।

কাজ শেষ হতে পিছিয়ে গেল, বুড়ো আঙুল খাড়া করে ওপরদিক দেখাল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে রিক ক্লের। কোনমতে মাথা ঝাঁকাল।

পানির ওপরে মাথা তোলামাত্র জ্ঞান হারাল সে।

দশ

ইনলেটের মুখ-সোজা এবড়োখেবড়ো স্তম্ভটার দুশো গজের মধ্যে পৌঁছে প্রথমবার মাথা তুলল মাসুদ রানা। কব্জিতে বাঁধা কম্পাসের লাবার লাইন আগে থেকে সেট করা ছিল বলে দিক ভুল হলো না। ঘুরে তাকাল। নাহ্, তাড়া করে আসেনি কোন ফ্রগম্যান। ওয়াচ বোটও নেই। আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিশ্চিত হয়ে নিল ও, তারপর পুরো স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। এর মানে ওরা দেখেনি ওকে। নাকি দেখেছে?

ফাঁদে আটকা পড়া রক্তাক্ত রিক ক্লের কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল রানার। ওরা কি মেরে ফেলেছে তাকে? নাকি জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছে? নির্যাতন করে কথা বের করার চেষ্টা করবে ওর মুখ থেকে? পরেরটাই মনে ধরল রানার। নিশ্চয়ই কমান্ডোরা জানতে চাইবে কেন সে গিয়েছিল ইনলেটে। হঠাৎ অন্য একটা সম্ভাবনার কথা খেয়াল হলো। ফ্রগম্যানরা যদি ওকে দেখে ফেলে থাকে, তাহলে হয়তো ছুটে আসতেও পারে। বলা যায় না। ব্যাটারা ওকে দেখেছে কি দেখেনি, জানে না রানা। কিন্তু তাই বলে সময় নষ্ট করার ঝুঁকিও নেয়া যাবে না। আগে সরে পড়তে হবে এখান থেকে, তারপর অন্য কথা।

সাঁতরাতে শুরু করল ও, মন জুড়ে আছে ইনলেট, বাংলার গৌরব, রিক ক্লে। জোর করে মন থেকে সব চিন্তা দূর করে দিল। চিন্তায় কাজ হবে না, এখন অ্যাকশন চাই। টিলায় পৌঁছল ও এক সময়, বয়ান্সি ট্যাঙ্ক খালি করে দুই জেট রেইডার ওপরে তুলল। একটার সাথে অন্যটা বেঁধে ফিরে চলল। সওয়ারীবিহীন হালকা দ্বিতীয় স্কুটার নিজের স্কি-শুর ওপর নাচতে নাচতে এগোল দড়ির টান খেয়ে।

ওর জানার উপায় নেই ওই সময়ই হরমুজ প্রণালীতে নাক ঢুকিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় এক জাহাজ। অপারেশন যেনেক টীমের মাদারশিপ ওটা। কমান্ডশিপ। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মুসানডেম পেনিনসুলার দক্ষিণ ফিওর্ডের দিকে। বারো সদস্যের আরেক স্ট্যান্ডবাই কমান্ডো টীম আছে ওটায়।

বাংলার গৌরব। ক্রু'জ মেস।

এককোণে গাদাগাদি করে বসে আছে সমস্ত স্টাফ। ক্যাপ্টেন ইউমেন্ডিসও আছে ওদের মধ্যে। সবার চেহারায় আতঙ্ক।

রুমের আরেক মাথায় পড়ে আছে ত্রিপলঢাকা একটা নিথর দেহ—মাসুদ রানার হার্পুন গানের শিকার। নিচে থেকে ছোঁড়া ডার্ট কোনাকুনি চোখ ভেদ করে মস্তিষ্কে ঢুকে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে লোকটা।

ওটার একটু দুরে বাল্কহেডে হেলান দিয়ে বসা রিক ক্লে। পরনে শুধু একটা স্পোর্টস শর্টস। বাঁ পাঁজরে ব্যান্ডেজ বাঁধা। চেহারা ফ্যাকাসে। ভেতরে ওষুধের কড়া গন্ধ ভাসছে। ইয়েহোনাথান নেতানিয়াহু হাঁটু গেড়ে বসে আছে তার সামনে। নির্বিকার চেহারা। চাউনি ক্লের মুখের ওপর স্থির।

'আরেকবার বলো,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে।

বিরক্তিতে চেহারা কুঁচকে উঠল ডাইভারের। 'আর কতবার বলব এক কথা?' ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'যতক্ষণ না আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি, বন্ধু, ততবার,' ক্রুর হাসি ফুটল তার চৌকো মুখে। 'এবং নতুন কিছু বলো। ওমান আর আমিরাতের হয়ে সাগরে তেলের খনি খুঁজে বেড়াচ্ছ ভাল কথা, কিন্তু রাতে কেন?'

'শিডিউল্ড্ টাইম ফুরিয়ে আসছে, তাই। এখন দিন-রাত দেখার সময় নেই, চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করছি আমরা।'

'হুঁম! তোমার সঙ্গীর নাম কি যেন বললে?'

'টোকিও। টোকিও জো।'

'তোমার পার্টনার?' ঝুঁকে এল নেতানিয়াহু।

'হ্যাঁ।'

'পালিয়ে গেল কেন সে? যদি...'

হাসতে গিয়ে চেহারা বিকৃত করে ফেলল সে পাঁজরে ব্যথার তীক্ষ্ণ খোঁচা খেয়ে। 'ভাল প্রশ্ন করেছ। ডাকাত পড়ল তাতে দোষ হলো না, দোষ হলো ওর পালিয়ে যাওয়ায়?' একটু থেমে থেকে

বলল, 'তোমরা কারা জানতে পারি? এখানে কি হচ্ছে এসব? এই জাহাজ...' থেমে গেল লোকটাকে হাসতে দেখে।

'তা তোমার না জানলেও চলবে। তুমি তাহলে ওমানী সিটিজেন?'

'বিশ্বাস না হলে মিনা কাবূজে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো। নাম বললে মাসকাটের সবাই চিনবে আমাকে।'

চিন্তিত চেহারায় লাশটার দিকে তাকাল কর্নেল ইয়োন্নি। ক্লের কথা ভুলেও বিশ্বাস করার কথা ভাবছে না সে। ভাবছে অন্য কিছু। শঙ্কা জাগছে মনে। ক'দিন আগে যাহাল যে সতর্কবাণী পাঠিয়েছে, সেটার কথা ভাবছে। জেরুজালেমের আশঙ্কাই কি সত্যি হতে যাচ্ছে?

কি করবে এখন সে? সমস্যা নিয়ে যে কারও সাথে কথা বলবে, সে পথ নেই। ওয়ানওয়ে কমিউনিকেশন সিস্টেম মেনে চলতে হচ্ছে তাকে কঠোরভাবে। কথা বলা যাবে না, টোটাল রেডিও সাইলেন্স, মাদারশিপের সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় থাকলেও নির্দেশ নেই। তিল পরিমাণ ঝুঁকিও নেয়া চলবে না। যা করার নিজেকে করতে হবে তাকে। ওদিকে পৌঁছতেও যথেষ্ট সময় নিয়েছে মাদারশিপ। প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা দেরি করে ফেলেছে।

নইলে এতক্ষণে সব অস্ত্র ওটায় তুলে ওরা সটকে পড়ত, কোন সমস্যা টিকিও ছুঁতে পারত না যেনেক টীমের। অবশ্য সেটা মাদারশিপের দোষ নয়, নিয়মিত রুটে যদি আসত বাংলার গৌরব, এর কিছুই ঘটত না। যা হোক, সব ভাল যার শেষ ভাল।

অবশেষে পৌঁছেছে মাদারশিপ ইরগুন লিউমি। রাডারে ওটার অবস্থান পরিষ্কার। আর মাত্র দুশো মাইল। ইয়োন্নি আশা করছে আগামীকাল রাতে এখানে পৌঁছবে ওটা। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাবে। কিন্তু এই লোকটার কথা যদি সত্যিই হয়, যদি ওর

বন্ধু টোকিও ফিরে গিয়ে ঘটনার কথা কর্তৃপক্ষকে জানায়, তাহলে নতুন ফ্যাঁকড়া বাধতে পারে। যদি নতুন কোন সমস্যা… রিক ক্লে ওরফে চায়না ক্লের দিকে মন দিল সে। সত্যি কথাটা বের করতে হবে এর মুখ থেকে। অনেক খোশগল্প হলো, এবার অন্যভাবে চেষ্টা করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

পুব আকাশে সবে আলোর আভাস ফুটতে শুরু করেছে তখন। 'মিস্টার ক্লে, তুমি ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলে। নিশ্চয়ই জানো কথা আদায় করার অনেক রকম টেকনিক আছে? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কি নিজের থেকে মুখ খুলবে, সত্যি কথাটা বলবে, নাকি আমাকে বের করে নিতে হবে?'

গলা শুকিয়ে উঠল ডাইভারের, কিন্তু সাহস ধরে রাখল জোর করে। 'তোমার যদি অকাজে নষ্ট করার মত সময় হাতে থাকে, তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু আমার নতুন কিছু বলার নেই।'

নিজের স্ফিংসের মুখোশের মধ্যে ঢুকে বসে আছে সার্জেন্ট দারভিশ হামাম। দু'চোখ মাসুদ রানার মুখের ওপর স্থির। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে একনাগাড়ে বলে যাচ্ছে ও। টোকিও, আতাসী ও জামাল শামলু, সবার নজর আঠার মত সেঁটে আছে তার ওপর। মানুষটার অদ্ভুত, অপূর্ব সমর কৌশল শুনে তাক্ লেগে গেছে প্রত্যেকের।

দারভিশ এখন বুঝতে পারছে কি আছে মেজরের মধ্যে, কেন মাসুদ রানা বলতে লেফটেন্যান্ট আতাসী অজ্ঞান। পরিকল্পনার সবই আগে থেকে মাথায় ছিল মেজরের, কাউকে কিছু বলেনি। এখন দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনীয় সবকিছুই হাতের কাছে মজুত, কিছুই কিনতে বাদ রাখেনি সে।

রানার পায়ের কাছের বড় পেইন্টের টিন দুটো দেখল দারভিশ. তারপর জামাল শামলুকে। ছেলেটাকে চেনাই যায় না এখন। একেই এতদিন সে ট্রেনিং দিয়েছে বিশ্বাস হতে চায় না। এ সেই মেয়েলী চেহারার যুবক, মনেই হয় না। আস্ত একটা খুনীর মত দেখাচ্ছে ওকে। ভেতরের ধিকি ধিকি আগুন চোখ দিয়ে ফুটে বের হচ্ছে যেন।

'বুঝতে পেরেছ সবাই?' বলা শেষ হতে প্রশ্ন করল রানা তীক্ষ্ণ, ব্যাটল ফিল্ড কমান্ডের সুরে।

'ইয়েস, স্যার, বস্!' আতাসী বলল। গম্ভীর।

'সার্জেন্ট?'

খাড়া হয়ে গেল সে। ক্র্যাকারের মত বিস্ফোরিত হলো। 'ইয়েস্স্যার।'

ঝট্ করে যুবকের দিকে ফিরল রানা। 'জামাল?'

'বুঝেছি, মেজর! স্যার!'

'কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

'একটা প্রশ্ন, বস্,' আতাসী বলল। 'কাজ সেরে ওপরেই বসে থাকব আমরা, না নেমে আসব?'

'একজন থাকবে। সবার সেদ্ধ হওয়ার কোন দরকার নেই। কে থাকবে লেফটেন্যান্ট ঠিক করবে। যেই থাকবে. ছায়া খুঁজে নিয়ো। নইলে ভিশনের রিফ্লেকশন ওদের চোখে পড়ে যেতে পারে। মাস্ট বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল।'

'শিওর।'

'নাউ মুভ!'

বাইরে আলোর আভাস সবে ফুটতে শুরু করেছে। গালফ পার্লের স্টারবোর্ড ডেভিট থেকে ধীরে ধীরে পানিতে নামানো হলো খুদে সাবমেরিন পিসি ১২০২। রিক ক্লে ওটার নাম রেখেছে মবি।

আবছা আলোতেও চকচক করে উঠল ওটার উজ্জ্বল হলুদ খোল। জিনিসটার নাক ভোঁতা। নাকই মবির ফরওয়ার্ড অবজার্ভেশন উইন্ডো। তার একটু পিছনে সাবমেরিনের মত কনিং টাওয়ার।

যা যা প্রয়োজন সব তুলে ফেলা হলো ঝট্পট্। তারপর হ্যাচ দিয়ে প্রথমে ঢুকল জামাল ও দারভিশ। ফিউযিলাজের পিছনের ডিএলও বা ডাইভার'স লুক আউট সীটে বসল ওরা, হাঁটু প্রায় বুকের সাথে ঠেকিয়ে। স্টীলের সিলিং নিচু বলে সীটও নিচু, তাই এরচেয়ে আরাম করে বসার উপায় নেই। ওদের দুদিকে দুটো অ্যাক্রিলিক প্লাস্টিকের ভিউপোর্ট, বাইরের সবই স্পষ্ট দেখা যায় ওখান দিয়ে।

আতাসী উঠল এবার। গোল কনিং টাওয়ার বরাবর নিচে, আরেক ভিউপোর্টের পিছনে বসল ট্যাঙ্ক কমান্ডারের মত। ফিউজিলাজের নিচে, বাইরে, স্টেইনলেস স্টীলের ব্র্যাকেটে ঝুলছে সমান্তরাল দুই ব্যাটারি পড। ও দুটোর জন্যে আজব কোন পোকার মত দেখাচ্ছে মবিকে।

করাচীতে এ জিনিস ড্রাইভ করার সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং নেয়া ছিল আতাসীর, তাই রেডিও মডেল কন্ট্রোল সেটের মত খুদে কনসোল চেক করে নিতে বিশেষ সমস্যা হলো না। ডান হাঁটুর কাছের ভার্টিকাল ও হরাইজন্টাল থ্রাস্টার চেক করল সে, রানাকে সঙ্কেত দিল উঠে দাঁড়িয়ে। 'বাঁধন খুলে দাও, বস্।'

লাইন খুলে ফেলল ও। আবার বসে পড়ল লেফটেন্যান্ট। চেহারায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সাগরকে এখন আর ভয় পাচ্ছে না বেদুইন। হাত তুলে ওপরের হ্যাচ বন্ধ করে কনসোলের পাওয়ার সুইচে চাপ দিল। অদ্ভুত চেহারার হলুদ সাবমেরিন গুঞ্জন তুলে স্টার্ট নিল, কাঁপছে অল্প অল্প।

রিভার্স দিয়ে বোট থেকে সরে এল আতাসী, ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক

খুলে দিল। তলিয়ে যেতে শুরু করল মবি। ডুবে যাওয়ার আগমুহূর্তে গানওয়েলে দাঁড়ানো উদ্বিগ্ন রানাকে পলকের দশ ভাগের একভাগ সময়ের জন্যে দেখতে পেল লেফটেন্যান্ট, পরক্ষণে উপসাগরের পানি ঢেকে দিল তার ভিউপোর্ট। তলিয়ে যেতে থাকল মবি।

ওটা অদৃশ্য হয়ে যেতে ঘুরল মাসুদ রানা, মাথা ঝাঁকাল টোকিওর উদ্দেশে। 'লেট'স গো।'

সগর্জনে স্টার্ট নিল গালফ পার্ল, অনেকটা জায়গা জুড়ে বাঁক নিয়ে উল্টোদিকে, রাস সারকানের দিকে ছুটল। বাঁক ঘোরা শেষ হওয়ার আগে কাঁধের ওপর দিয়ে দূরের ইনলেটের দিকে তাকাল রানা। শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল। চারদিক মোটামুটি ফরসা হয়ে উঠেছে তখন। হুইলহাউসে ঢুকে টোকিওকে 'ফুল স্পীড অ্যাহেড' নির্দেশ দিল ও। পানিতে তুমুল আলোড়ন তুলে সর্বোচ্চ বিশ নট গতিতে ছুটল গালফ পার্ল।

এদিকে ত্রিশ ফ্যাদম নেমে থামল আতাসী, ব্যালাস্ট সেট করে ফরওয়ার্ড থ্রাস্ট স্টিক কাছে টানল। আওয়াজ পাল্টে গেল মবির, এ ছাড়া অন্য কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না তখনই। পড়ল একটু পর, ভিউ পোর্টের ওপাশে প্ল্যাঙ্কটনের উল্টোমুখী স্রোত দেখে বোঝা গেল এগোচ্ছে সাবমেরিন।

'কোন সমস্যা, সার্জেন্ট?' প্রশ্ন করল আতাসী।

'না, স্যার।' পাশে তাকিয়ে জামালকে ঘামতে দেখল দারভিশ। 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?'

'আমি...আমি সাঁতার জানি না,' ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল সে। 'খুব ভয় করছে আমার।'

'কাম অন, বয়। ছেলেমানুষের মত কথা বোলো না,' ধমকে উঠল দারভিশ। 'সাঁতার কাটতে যাচ্ছ না তুমি, যাচ্ছ লড়াই

করতে।'

আতাসী শব্দ করে হাসল। 'সার্জেন্ট, আমিও কিন্তু সাঁতার জানি না, এবং ভয় আমারও করছে খুব। বোধহয় ওরচেয়ে বেশি।'

মৃদু হাসল দারভিশ, ভিউপোর্ট দিয়ে বাইরে তাকাল। ওদিকে আতাসীর পুরো একটা ঘণ্টা কাটল সোনার, ডেপথ গজ, এয়ার মিক্স ইত্যাদির ওপর কড়া নজর রেখে। এমন সমস্ত জিনিস, একটাও সামান্য এদিক-ওদিক করলে পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর। মৃদু টিক্ টিক্ আওয়াজটা শুরু হতে মনে হলো জীবন বুঝি ধন্য হলো। ওয়েসমার সোনার লোকেটর ওটা, সামনে কঠিন বাধা টের পেয়ে সঙ্কেত দিতে শুরু করেছে।

আওয়াজটা বাড়ছে ক্রমে। টিক্ টিক্ দ্রুততর হচ্ছে। রাডার স্ক্যানে বিশাল একটা ছায়া ফুটছে–ইনলেট ঘিরে থাকা পাথুরে জেবেল ওটা। চকিতে কব্জিতে বাঁধা কম্পাসে চোখ ঝুলিয়ে নিল আতাসী, ঠিকই আছে। রানা সেট করে দিয়েছে, কাজেই দিক ভুল হওয়ার সুযোগ নেই। ছায়া আরও বড় হলো, পুরো স্ক্যানার ঢেকে ফেলল। থ্রাস্ট সামনে ঠেলে গতি একদম কমিয়ে দিল আতাসী, ব্যালাস্ট থেকে অনেকটা পানি রিলিজ করে পনেরো ফুটে উঠে এল, তারপর পাঁচ ফুটে।

ভিউপোর্ট দিয়ে বেশ আলো ঢুকছে ভেতরে, তার মানে সূর্য উঠেছে। পিঁপড়ের গতিতে এগোল পিসি, আতাসীর নজর সেঁটে আছে ভিউপোর্টের ওপাশে। ধাক্কা লাগার আগে দেয়ালের দেখা পেতে চায়। দশ মিনিট পর দেখা মিলল, সঙ্গে সঙ্গে থ্রাস্ট স্টিক পুরো সামনে ঠেলে দিল সে, প্রায় জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা।

'এবার তোমার ওস্তাদীর পালা, সার্জেন্ট। অঘাটে ভিড়িয়ে থাকলে ঘাটে টেনে নিয়ে চলো আমাদের।'

নীরবে কাজে লেগে পড়ল দারভিশ। অল্প জায়গায় যথেষ্ট

কসরত করে এয়ারসাপ্লাই ট্যাঙ্ক-পাইপসহ হার্নেস পরল। কোমরে ওয়েটবেল্ট। এরপর পরল মাস্ক, মাউথপীস লাগিয়ে এয়ারসাপ্লাই ঠিক আছে কি না দেখে নিল। বেল্টের খাপে ঢোকাল গার্বার। একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ বাঁ বগলের নিচে ঝোলাল ফিতে ঘুরিয়ে ওপাশের কাঁধে রেখে, তারপর নাইলনের দড়ির ছোটখাট একটা কয়েল তুলে নিল। 'চললাম।'

জবাবের আশায় না থেকে ডিএলও কম্পার্টমেন্টে চলে এল সে। পিছনে কানেকটিং হ্যাচ লাগিয়ে দিল আতাসী, অ্যাফট সেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অন্য অংশ থেকে। ঝুঁকে লোয়ার হ্যাচ খোলার জন্যে তৈরি হলো সার্জেন্ট, ওদিকে আতাসী এয়ার প্রেশারের সুইচ টিপে দিল। এয়ার পকেট কম্পার্টমেন্টে বাতাসের অসহ্য হিশ্‌শ্‌ শব্দে কানে হাত চাপা দিতে বাধ্য হলো দারভিশ। প্রেশার গজ থেকে চোখ তুলে ওকে সঙ্কেত দিল লেফটেন্যান্ট, পা দিয়ে জোরে হ্যাচে চাপ দিল দারভিশ, নিচের পানির বাধা অগ্রাহ্য করে খুলে গেল ওটা, কিন্তু এয়ার প্রেশারের জন্যে এক ফোঁটা পানিও ঢোকার সুযোগ পেল না। একটা বুদ্বুদও উঠল না।

যেন কুয়োয় নামছে, এমনভাবে নেমে গেল দারভিশ। হ্যাচ ওপরে ঠেলে দিল, লেগে গেল ওটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে। বেরিয়ে এসে রশির একমাথা দিয়ে পিসির হুক মজবুত করে বাঁধল সার্জেন্ট, তারপর দড়ি ছাড়তে ছাড়তে তীরের দিকে এগোল। বিশ গজমত যেতে পায়ে শক্ত পাথরের ছোঁয়া পেতে দাঁড়িয়ে একটু দম নিল। আবার এগোল।

খাড়া উঠছে তীর, সে-ও উঠছে। আরও বিশ-পঁচিশ গজ এগোতে টের পেল সারফেস প্রায় মাথায় ঠেকেছে। ধীরে ধীরে পানির ওপর মাথা তুলল সার্জেন্ট। সামনেই জেবেলের আকাশছোঁয়া গা, কম করেও তিনশো ফুট উঁচু হবে গায়ে গা

ঠেকিয়ে দাঁড়ানো অসংখ্য ক্লিফ। ইনলেটের বাইরের দিক এটা। খুঁজে পেতে পছন্দসই একটা জায়গা বের করল সে। পাথরের বেশ বড় একটা অংশ শেলফের মত বেরিয়ে আছে সাগরের দিকে।

ঢুকে পড়ল ওটার তলায়। অনেক জায়গা, অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে পিসি। পানির গভীরতা আর সিলিঙের উচ্চতা অনুমান করে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলো দারভিশ, শক্ত পাথরে পা বাঁধিয়ে দড়ি টানতে শুরু করল। দশ মিনিট পর ওখানটায় মাথা তুলল খুদে সাবমেরিন। একদম শান্ত, নিরিবিলি জায়গা। ওপর থেকে তো নয়ই, সাগর থেকেও দেখে ফেলার কোন সম্ভাবনা নেই।

সূর্য এরমধ্যে বেশ খানিকটা উঠে পড়েছে, অসহ্য হয়ে উঠেছে গরম। খোলা জায়গার কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না, সব কাঁপছে। ব্যস্ত হয়ে পরের কাজের জন্যে তৈরি হলো ওরা। পেইন্টের টিন দুটো বিশেষ স্ট্র্যাপের সাহায্যে পিঠে ঝুলিয়ে নিল আতাসী ও দারভিশ। সবার পেটের কাছে বড় একটা থলে ঝুলছে। ওতে আছে যার যার বুটাইল নাইলনের ম্যানহক অ্যাবসেইল হার্নেস। কমপ্লিট বিল্ট-ইন অ্যামুনিশন পাউচ ও ডিসেন্ট লিভার আছে তার সাথে। প্রয়োজনে এক হাতের সাহায্যে নামা যাবে অন্য হাত গুলি করার জন্যে প্রস্তুত রেখে।

জামাল শামলুর কাঁধে অস্ত্র ছাড়া বাড়তি একটা জিনিস থাকল। বাষট্টি মিটার দীর্ঘ অ্যাবসেইল দড়ির একটা কয়েল।

'শুরু করা যাক এবার,' বলল আতাসী। কোনমতে চেপে লাগিয়ে রাখা রঙের টিনের ঢাকনা খুলল। ব্রাশ দিয়ে খানিকটা রঙ নিয়ে জেবেলের গায়ে লম্বা করে একটা পোচ দিল। রঙটা হালকা নীল, ইলিউমিনেটেড। রাত হলে রেডিয়ামের মত জ্বল জ্বল করবে অন্ধকারে।

চড়তে শুরু করল ওরা তিনজন। সতর্ক। ঘন ঘন মুখ তুলে দেখে নিচ্ছে ওপরে গার্ড আছে কি না। জেবেলের এবড়োখেবড়ো ঢালু গায়ের ফাটল, গর্ত ইত্যাদির কিনারা ধরে সন্তর্পণে কয়েক ফুট উঠছে আতাসী ও দারভিশ, থেমে রঙ দিয়ে লাইন আঁকছে, ফের উঠছে। জামাল অনুসরণ করছে ওদের। দ্রুত, অনায়াস দক্ষতার সাথে উঠে যাচ্ছে দলটা তরতর করে।

থেমে থেমে উঠতে হচ্ছে বলে রিজে পৌঁছতে একটু বেশি সময় লাগল। মোট সত্তর মিনিট। ওপরে উঠে বহুগুণ সতর্ক হয়ে উঠল ওরা, একটা ছায়া জায়গা বের করে গাট্টি বোঁচকা নামিয়ে বসল। একটু জিরিয়ে নিয়ে সাবধানে উঁকি দিল ভেতরদিকে। প্রথমে চোখে পড়ল না কিছুই। তারপর, হঠাৎ করেই দেখা দিল বাংলার গৌরব। দুইশো ফুট নিচে।

ওদের পঞ্চাশ-ষাট গজ বাঁয়ে। ক্যামোফ্লেজ ড্রেপস্ দিয়ে এমনভাবে ঢাকা যে সনাক্ত করা কঠিন। কয়েকটা জায়গায় আচ্ছাদন নেই। আফটার সুপারস্ট্রাকচার, বো এবং অ্যামিডশিপ, এই তিন জায়গা খোলা। তিন হেভি মেশিনগানের সেন্ট্রি পয়েন্ট ওগুলো। একজন করে কমান্ডো বসে আছে তিন পয়েন্টে, গান ব্যারেল ইনলেটের মুখের দিকে তাক্ করা। নাহ্, রানার আশঙ্কা মিথ্যে। ওপরে কোন গার্ড নেই।

বাইরের মত ভেতরেও একটা পাথরের শেলফ আছে। ওটার কিনারায় পৌঁছতে পারলে সহজেই লাফ দিয়ে পড়া যাবে জাহাজের ডেকে। পিছিয়ে এল ওরা, ছায়ায় বসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। এমন সময় ওপর দিয়ে বিকট শব্দে উড়ে গেল একটা ফাইটার।

ওরা চারজন দফার উপজাতির। ওমানী নৌ কমান্ডো বাহিনীর

সদস্য। ট্রাইব চীফ শেখ আজিজ বিন সাউদ বিন নাসির আল জাফরের বিশেষ নির্দেশে ছুটি নিয়েছে সাতদিনের।

দুর্ধর্ষ, ডাকাতের মত চেহারা প্রত্যেকের। ষাঁড়ের মত স্বাস্থ্য। ইনলেট আর রাস সারকানের মাঝখানের আরেক দ্বীপ নিজওয়ায় অপেক্ষায় ছিল। জেবেল আখদার রেঞ্জের দ্বীপ ওটা। মেইনল্যান্ডের সাথে এ অঞ্চলে একমাত্র এই দ্বীপেরই সড়ক যোগাযোগ আছে। মাঝে ছোট একটা ফেরি আছে অবশ্য।

জেটির দিকে এগোতে থাকা গালফ পার্লকে ওদের একজন দেখল প্রথমে। সে দেখাল অন্যদের। একটু পর লম্বা এক কাঠের জেটিতে ভিড়ল ওটা। ততক্ষণে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে চার কমান্ডো। সাহায্য দরকার হলেই ওটার ফিরে আসার কথা ছিল। উঠে পড়ল লোকগুলো, যা জানার, পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেনে নিল।

মাসিরাহ। ওমান মেইনল্যান্ডের সামান্য দূরে গালফ অভ মাসিরাহ্‌র ছোট এক দ্বীপ। ওমানী এয়ারফোর্সের ৮ম স্কোয়াড্রনের বেজ এখানে।

সকাল ন'টায় রিপোর্টিং সেরে বেজের খোলা টারমাকে বেরিয়ে এল ফাইটার পাইলট নাফিজ মুলতানী। পাকিস্তানী সে। একটু পর নিজের মেটে ও বাদামী ডেজার্ট ক্যামোফ্লেজড্‌ রঙের জাগুয়ার অ্যাটাক জেট নিয়ে আকাশে উঠল নিয়মিত মহড়ায়। সুইপিঙ কোর্স ধরে উত্তর-পশ্চিমদিকে ছুটল রোদের অসহ্য তাপে ভাজা হতে থাকা মরুভূমির ওপর দিয়ে। এলাকাটা সম্পূর্ণ জনবসতিহীন।

অনেক ওপর দিয়ে নিজওয়া-সালালাহ্‌র নিঃসঙ্গ, ফিতের মত উপকূলীয় হাইওয়ে পেরিয়ে গেল নাফিজ। দেশের উত্তর ও দক্ষিণের একমাত্র সংযোগ সড়ক ওটা। প্রতিবেশী আরব

আমিরাতের ক্লিয়ারেন্স চাইল সে, পেয়েও গেল সঙ্গে সঙ্গে। এটাও নিয়মিত ব্যাপার। ওদের আকাশসীমায় ঢুকে মুসানডেম পেনিনসুলার দিকে নাক ঘুরিয়ে লাগাল লম্বা দৌড়।

খানিকটা গিয়ে হাইট কমাল পাইলট, জেবেল রেঞ্জ চোখে পড়তে আরেকটু নামল। বিদ্যুৎগতিতে ধেয়ে চলল যে ইনলেটে বাংলার গৌরব আছে, সেদিকে। আরও নামল নাফিজ, নামতেই থাকল। খুব নিচু দিয়ে ইনলেট পেরিয়ে গেল জাগুয়ার, এত নিচু দিয়ে যে জেবেলের উঁচুনিচু চুড়োর ধুলো উড়তে শুরু করল প্লেনের আফটার বার্নারের গরম বাতাসে।

পরপর চারটে চক্কর দিল সে একই জায়গার ওপর দিয়ে, কিন্তু চোখে পড়ল না কিছু। ঠিক হ্যায়, ভাবল পাকিস্তানী, আব যারা দরিয়ামে (এবার সমুদ্রে)।

খোলা সাগরে এসে পড়ল সে। মাসুদ রানা বলেছিল জেবেল রেঞ্জেই আছে ওদের জাহাজ। যদি ওটার দেখা পাওয়া না যায়, তাহলে যেন সাগরে কয়েকটা চক্কর দেয় সে। কিছু না, অস্বাভাবিক কোন তৎপরতা চোখে পড়ে কি না খেয়াল রাখতে। রানাও আশেপাশেই থাকবে, প্রয়োজন দেখলে নাফিজের সাহায্য চাইবে। কিন্তু না, কোনটাই চোখে পড়ল না। না জাহাজ, না অস্বাভাবিক কোন তৎপরতা।

লম্বা কয়েক চক্কর দিল সে সাগরে। কিন্তু মাছ ধরা ডাউ আর একটা ছোট বোট ছাড়া তেমন কিছু চোখে পড়ল না। সব স্বাভাবিক, ওগুলো...ভাবনা হোঁচট খেল পাইলটের। জাস্ট আ মিনিট! ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যানোপির বাইরে, পিছনে তাকাল। আনমনা। ওই বোটটা...বেশ জোরে ছুটছে না? প্রশ্ন করল সে নিজেকে। ওটার বো ওয়াশ দেখে তো মনে হলো যেন তুফান বেগে ছুটছে। কেন? একবার দেখতে হয়।

টুইন অ্যাডর এঞ্জিনের আওয়াজ পাল্টে গেল জাগুয়ার অ্যাটাক জেট আচমকা বাঁক নিতে। বড় এক বৃত্ত তৈরি করে ফিরে চলল ওটা, সেকেন্ডে সেকেন্ডে নামছে। পরস্পরের দিকে ধেয়ে চলেছে বোট আর ফাইটার। বোটের প্রায় মাস্ট ছুঁয়ে সাঁ করে ছুটে গেল নাফিজ। এতই নিচু দিয়ে যে আচমকা আসমানী বালা ছুটে আসতে দেখে ফোরডেকে দাঁড়ানো লোকটাকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতে দেখল সে। এবং দেখেই বুঝল ও ব্যাটা জাপানী।

ঘুরে এসে একইভাবে আরেক রাউন্ড দিল পাইলট। এবার রানাকে দেখল, হাত নাড়ছে তার উদ্দেশে। পাল্টা হাত নাড়ল নাফিজ, মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল গালফ পার্লের ওপর দিয়ে।

জেরুজালেম।

যেনেক প্ল্যানিং কমিটির বৈঠক চলছে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে। যাহাল প্রধান মেজর জেনারেল ইয়াদ এলিয়াহুদের চেহারা বেশ শুকনো দেখাচ্ছে আজ। চোখ লাল। বেন মেইর গম্ভীর, গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।

'আগেই বলেছি ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না,' বিড় বিড় করে বলল মোসাদ প্রধান। 'জাহাজটা ওখানে বসিয়ে রাখার ঝুঁকি নেয়া উচিত হয়নি।'

এলিয়াহুদ বুঝল পরোক্ষে অভিযোগ করছে মানুষটা। কিছু একটা কড়া জবাব এসে পড়েছিল জিভের ডগায়, কিন্তু বলল না শেষ পর্যন্ত। অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ কি? ওদিকে প্রধানমন্ত্রী দুই সংস্থা প্রধানের মর্যাদার লড়াই বেধে যেতে পারে ভেবে সামাল দেয়ার চেষ্টা করল তাড়াতাড়ি। 'এখন অতীত বাদ দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা উচিত,' মৃদু গলায় বলল সে।

দু'জনের একজনও কোন মন্তব্য করল না দেখে মুখ খুলল

আবার। এলিয়াহুদকে প্রশ্ন করল, 'ওখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি কি?'

অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল মেজর জেনারেল। 'গতরাতে কিছু একটা ঘটেছে ওখানে, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার। ওদের কথা বলা নিষেধ, তাই বুঝতে পারছি না। তবে কমিউনিকেশন সিস্টেম অন আছে বলে যে এক-আধটু আভাস পাচ্ছি, তাতে মনে হয় জাহাজ স্পট করেছে কারা যেন। একজন ধরা পড়েছে ওদের, আরেকজন পালিয়েছে। আর...'

'আর কি?'

'আমাদের এক কমান্ডো মারা গেছে।' ঘরের পরিবেশ টান্‌টান্‌ হয়ে উঠেছে টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তবে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে এখনও। মাদারশিপ বলছে, রেডিওতে মাঝে মাঝে ইয়োন্নির গলা শোনা যাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ না থাকলে নিশ্চই তা হত না।'

হেলান দিল প্রধানমন্ত্রী। 'মাদারশিপের পজিশন?'

'আজ ভোররাতে জায়গামত পৌঁছবে ওটা, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার।'

চেহারার মেঘ কিছুটা কাটল তার। 'শিওর?'

'শিওর! পেনিনসুলায় ঢুকেছে ইরগুন লিউমি।'

'গুড। ভাল একটা খবর শোনালেন।'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা দোলাল ইয়েহুদা বেন মেইর। 'কারা বাংলার গৌরবকে স্পট করেছে আমরা জানি না,' তবে তারা যে প্রফেশনাল, কোন সন্দেহ নেই তাতে। মাদারশিপ পৌঁছার আগে যদি ওরা সরাসরি আক্রমণই করে বসে বাংলার গৌরবকে, আমার মনে হয় না কর্নেল ইয়োন্নি ঠেকাতে পারবে। কারণ সে ক্ষেত্রে পুরো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই আসবে আক্রমণকারীরা।

‘ওদের সুলতান আরাফাতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনি জানেন। হয়তো দেখা যাবে ওমানের সরকারী ফোর্সই আনঅফিশিয়ালী অ্যাসল্ট চালিয়ে বসেছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের কোন চান্স নেই। সব প্ল্যান শেষ পর্যন্ত মাঠে মারা যাবে। মাসুদ রানা ওদেশে আছে কি না জানা যায়নি। হয়তো আছে, ছদ্মবেশে ঢুকেছে। আগে দারভিশ আর তার সঙ্গীকে পাঠিয়েছে ডিকয় হিসেবে। তবে আমার অনুমান, ও আছে ওমানে। এসব ওরই কীর্তি।’

‘বুঝলাম,’ মাথা দোলাল প্রধানমন্ত্রী। ‘কিন্তু আপনার মেজর রোমানের ব্যাপার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার। তার সাড়া নেই কেন? অভিজ্ঞ অফিসার সে। এসব কিছুই টের পাচ্ছে না, তা কি করে হয়? আমরা সতর্ক করে দেয়ার পরও সে অ্যালার্ট হচ্ছে না কেন?’

‘হ্যাঁ, তাই তো!’ নিজের ভুল চাপা দেয়ার দারুণ এক সুযোগ পেয়ে চেপে ধরল এলিয়াহুদ। ‘সে তো আপনার লোক। তার ভরসাতেই না কাজটা আমরা ওই অঞ্চলে করব বলে ঠিক করেছিলাম। প্রচুর টাকাও তো দেয়া হয়েছে লোকটাকে। এমন জরুরী সময়ে হঠাৎ পিঠটান দিল কেন সে?’

উত্তর জোগাল না মোসাদ প্রধানের মুখে, অসহায় বোধ করল সে।

এগারো

রাত গভীর হচ্ছে মুসানডেম পেনিনসুলায়। হরমুজ প্রণালীর দক্ষিণ ফিওর্ড ধরে দ্রুত উত্তরদিকে এগিয়ে চলেছে বড়সড় এক জাহাজ। বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত অন্ধকারে ডুবে আছে ওটার। আলো বের হওয়ার সমস্ত পথ পুরু কালো কাগজ সেঁটে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দৈত্যাকার এক প্রাগৈতিহাসিক জলদানবের মত গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে যেন ওটা। ভারী ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া প্রাণের আর কোন সাড়া নেই কোথাও।

ইরগুন লিউমি ওটার নাম। দশ হাজার টনী ফ্রেইটার। স্টার সাইড ব্রিজ উইঙে বড় ধরনের কি যেন একটা আছে, ত্রিপল দিয়ে ঢাকা বলে দেখা যায় না। গন্তব্যের বেশ কাছে এসে পড়েছে, তাই কাগজ দিয়ে ঢাকা ভেতরের আলোকিত ক্রু'জ মেসে জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত একদল লোক। বারোজন ওরা, যেনেক টীমের সাহায্যকারী ইউনিট।

ওদিকে ইনলেটের চার মাইল দূরে খোলা সাগরে দাঁড়িয়ে আছে গালফ পার্ল। ওটাও অন্ধকার। ফোরডেকে দাঁড়িয়ে চার দফারের সাথে শেষ মুহূর্তের আলোচনা সেরে নিচ্ছে মাসুদ রানা। নাইটভিশন দিয়ে তাকালে জেবেলের গায়ে আঁকা ইলিউমিনেটেড পেইন্টের কাটা কাটা দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। এগারোটার দিকে

ব্রীফিং শেষ হতে লোকগুলোকে তৈরি হয়ে নিতে বলল রানা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো কাপড়ে মোড়া ওরা পাঁচজন যখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত, ঘড়ির কাঁটা তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।

দুই ওয়াটার স্কুটার জেট রেইডার নামানো হলো পানিতে। অ্যাভনও। বক্স থেকে বের হলো পর্যাপ্ত গুলিসহ আধ ডজন স্টার্লিং, একটা জিপিএমজি, অ্যামিউনিশন বেল্ট। একটা কার্বন ফাইবার গ্র্যাপনেলের কমপ্রেসড্ এয়ার লঞ্চার। দুটো স্টার্লিং, জিপিএমজি ও লঞ্চার নিয়ে অ্যাভনে উঠল দুই দফার। রানাসহ অন্য দু'জন স্কুটারে। একজনকে নিজের পিছনে বসাল রানা।

জিনিসপত্র সব উঠেছে কি না দ্রুত চেক করে দেখল টোকিও, তারপর সঙ্কেত দিল। রওনা হয়ে গেল দল। একটু পর আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল ওরা, মোটরের আওয়াজ আর শুনতে পেল না টোকিও। দশ মিনিট পর দাগ বরাবর নিচে জেবেলের পাথরের মেঝেতে মৃদু ঘষা খেয়ে থেমে দাঁড়াল দুই জেট রেইডার। প্রায় একই মুহূর্তে পৌঁছল অ্যাভন।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা, মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হয়ে। কাঁটায় কাঁটায় একটা। আতাসী আর জামাল শামলু এগিয়ে এল অন্ধকারের ভেতর থেকে। অ্যাকশনের গন্ধে, উত্তেজনায় চকচক করছে যুবকের দু'চোখ। দারভিশ ওপরে। আতাসীর সাথে মিনিট দুয়েক কথা বলে যা জানার জেনে নিল রানা, কথা বলল সঙ্গী দুই দফারের সাথে। তারপর অ্যাভনের দু'জনের সাথে। আলাপ সেরে তাদের লীডারের সাথে ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিল। জামাল এরমধ্যে স্কুটার দুটো বেঁধে রেখে এল পিসির সাথে।

রেডি!

ভেঙে পড়া ঢেউয়ের গুঁড়ো পানির কণায় চোখমুখ ভিজে গেছে রানার, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। বাতাস বইছে, বেশ ঠাণ্ডা।

চাঁদ উঠেছে, অল্প হলেও রূপালী আলোয় চারদিক মোটামুটি দেখা যায়। জেবেলের চূড়াও।

রানার ব্যস্ততা নেই। ধীরেসুস্থে কাজ সারছে। রাত যত গভীর হবে, ভেতরের ওদের টেনশন তত কমবে, পাহারায় ততই ঢিল দেয়া শুরু হবে। ওই সময়টা বেছে নিয়েছে রানা কাজ সারা সহজ হবে বলে। লোকগুলো ভুল করেছে, মনে মনে বলল ও, মারাত্মক ভুল করেছে। ওপরে অন্তত একজন ওয়াচার রাখা উচিত ছিল ওদের। প্রফেশনালদের এ ভুল মানায় না।

আগে না হয় রাখেনি, কিন্তু পরপর দুটো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তো ওদের লীডারের এ নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তা করা উচিত ছিল। ভয় ছিল রানার, তাই আগেভাগে আতাসীকে নিশ্চিত হতে পাঠিয়েছিল। ভয়টা অমূলক ছিল। ও পক্ষের লীডার মানুষটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী, শুধু সামনেই দেখে। পিছনে দেখে না।

হিট আওয়ার মাইনাস ওয়ান।

আর ঠিক এক ঘণ্টা পর ইনলেটের মুখে দেখা দেবে অ্যাভন। ওটার দুই কমান্ডোর উদ্দেশে নীরবে হাত নাড়ল রানা, ঘুরে দাঁড়াল। ইলিউমিনেটেড লাইন বরাবর উঠতে শুরু করল তরতর করে। অন্যরা নিশ্চিন্ত মনে অনুসরণ করল। ওদের সুবিধের জন্যে এপাশে লাইন ঝুলিয়ে রেখেছিল আতাসী, কিন্তু প্রয়োজন পড়ল না ওটার। খালি হাতেই উঠে এল সবাই।

ঠিক পঁচিশ মিনিটের মাথায় ওরা পাঁচজন এসে যোগ দিল সার্জেন্ট হামামের সাথে। পাঁচটা নতুন অ্যাবসেইল রোপ কয়েলের এক মাথা বাঁধা হলো, কয়েল ওপরেই থাকল, সময়মত ফেলা হবে। বুটাইল নাইলনের ম্যানহক হার্নেস পরে তৈরি হলো সবাই। উত্তেজিত। কাঁপছে একটু একটু। দরদর করে ঘামছে। উৎকণ্ঠা বাড়ছে। অ্যাড্রেনাইল পাম্পিং দ্রুততর হচ্ছে।

চাঁদের আলো আরও বেড়েছে। উপুড় হয়ে শুয়ে ইমেজ ইনটেন্সিফাইয়ার চোখে লাগিয়ে দুশো ফুট নিচে তাকাল মাসুদ রানা। তিন সেন্ট্রি পোস্টের ওপর নজর বোলাল। অ্যাফট সুপারস্ট্রাকচারের সেন্ট্রি ঢুলছে। অন্য দু'জন সজাগ। বসে আছে হেভি মেশিনগানের পিছনে।

হিট আওয়ার পনেরো মিনিট।

পাশ থেকে একনাগাড়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করছে জামাল, দম নিচ্ছে। ঘামে সারা মুখ চক চক করছে ওর। নজর সেঁটে আছে বাংলার গৌরবের ওপর।

হিট আওয়ার দশ মিনিট।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা দেবে ওটা।

ইনলেটের চওড়া মুখ দিয়ে খোলা সাগরের দিকে তাকাল রানা। দেখা নেই এখনও। ডানে-বাঁয়ে যতদূর সম্ভব চোখ বুলিয়ে নিল আরেকবার। নেই।

হিট আওয়ার পাঁচ মিনিট।

'লাইন ফেলো!' চাপা গলায় নির্দেশ দিল ও।

ব্যস্ত হয়ে উঠল অন্য সবাই। বেশি উঁচু হলে বা ঝুঁকলে আকাশের পটভূমিতে কমান্ডোদের চোখে পড়ে যেতে পারে, সেদিকে সতর্ক নজর রেখে অ্যাবসেইল রোপ ছাড়তে শুরু করল। পাশাপাশি সাপের মত মোচড় খেতে খেতে নেমে গেল পাঁচটা লাইন, প্রথমটা নামল সবশেষে।

হিট আওয়ার চার মিনিট।

লাইনে হার্নেস জুড়ে তৈরি ওরা। রানা পলকহীন চোখে সামনে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ করে দেখা দিল অ্যাভন। অনেকটা পথ ঘুরে এলেও সময় এদিক-ওদিক হয়নি লীডারের, ঠিকই আছে। ঠিক সময়ই পৌঁছবে জায়গামত। পানিতে প্রায় চ্যাপ্টা মনে

হচ্ছে ওটাকে ওপর থেকে, চাঁদের আলোয় চক-চক করছে কালো দেহ। মোটরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, তার মানে ধীরগতিতে আসছে। হুঙ্কার ছেড়ে ছুটতে শুরু করবে এখনই।

'চেক্!' নির্দেশ দিল রানা রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে।

হিট আওয়ার তিন মিনিট।

দ্রুত যে যার হার্নেস, ডিসেন্ট লিভার, সেফটি লিভার, কক্ড্ হ্যান্ডেল চেক্ করে নিল প্রত্যেকে।

হিট আওয়ার দুই মিনিট।

নিচে তাকাল রানা। এতক্ষণে সেন্ট্রিদের নজর যাওয়া উচিত ছিল ওদিকে। অন্ধ নাকি ওরা? না ঘুমিয়ে আছে?

হিট আওয়ার এক মিনিট।

'জাম্প!'

জেবেলের ভেতরের খাড়া গা ঘেঁষে শূন্যে ঝুলে পড়ল ছয়টা ছায়া, একই মুহূর্তে ইনলেটের বাইরে হুঙ্কার ছাড়ল অ্যাভন। নাক উঁচু করে ছুটে আসতে শুরু করল। ওদিকে ছায়াগুলো তরতর করে নেমে আসছে, সবার এক হাত হার্নেসের সেফটি লিভারে, আরেক হাতে কারবাইন। একশো ফুট নেমে এসেছে ওরা, তখনই ঘটল ব্যাপারটা।

মিডশিপ অবজার্ভেশন পোস্টের সেন্ট্রি চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ গলায়, মুহূর্তে হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল।

কলজে এক লাফে জিভের ডগায় পৌঁছে গেল রানার, কিন্তু না, অ্যাবসেইল টীম নয়, ওদের লক্ষ্য অ্যাভন। হুঙ্কার ছেড়ে উঠল বো-র হেভি মেশিনগান, কেঁপে উঠল মুসানডেম পেনিনসুলা। দীর্ঘ এক সারি ট্রেসার বুলেট রঙধনুর মত বাঁক খেয়ে ছুটে গেল অগ্রসরমান বোটটার দিকে। সাঁৎ করে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গেল অ্যাভন, জবাব দিতে শুরু করল জিপিএমজির সাহায্যে।

এদিকে রানার পাশে ফেইল-সেফের লিভার টেনে নিজেকে থামাল দারভিশ হামাম, দু'হাতে সাব-মেশিনগান ধরে যত্নের সাথে করল প্রথম ব্রাশ ফায়ার। আঁতকে উঠে মুখ তুলল সেন্ট্রি, পরমুহূর্তে মাঝ বরাবর জায়গা থেকে নিখুঁতভাবে কাটা পড়ল দ্বিতীয় ব্রাশে। আরেকজন ছুটে এসে দাঁড়াল ওখানটায়, কোনরকম ডিফেন্স নেয়ার কথা ভুলে আহাম্মকের মত ওপরে তাকাল। জামালের স্টার্লিং ব্যবস্থা করল তার। টানা ব্রাশ ফায়ারে ডেক প্লেটের সাথে গেঁথে ফেলল সে তাকে। ভাঙাচোরা পুতুলের মত পড়ে থাকল লোকটা।

এঁকেবেঁকে ইনলেট মাউথের কাছে পৌঁছে গেছে অ্যাভন, জিপিএমজির অ্যামিউনিশন বেল্ট ঝাঁকি খাচ্ছে অনবরত, ব্রিচ হয়ে মায্‌ল্ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট আগুন ছিটিয়ে। যেন ঝাঁঝরা করে দেবে বাংলার গৌরবের হাল।

হঠাৎ রাতকে দিন করে জ্বলে উঠল একটা সার্চলাইট, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল অ্যাভনের গুলির আঘাতে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। একই মুহূর্তে বো-র সাথে ফিট করা বিশেষ বো-স দিয়ে মনোফিলামেন্ট নেট কেটে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওটা।

ফ্রেইটারের ডেকে এলোপাতাড়ি দৌড় ঝাঁপ করছে কমান্ডোরা। ওপরের খেলা যারা দেখেছে, তারা মরার আগে যমদূত কোনদিক থেকে এসেছে, সে খবরটা দিয়ে যেতে পারেনি, তাই ওপরেরদিকে খেয়াল নেই ওদের, ব্যস্ত হয়ে নিচে উঁকিঝুঁকি মারছে। কিন্তু ওরা ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই ফ্রেইটারের গায়ে ভিড়ে গেছে অ্যাভন, কমপ্রেসড্-এয়ার লঞ্চারের আওয়াজ ওপর থেকে পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। গ্যাস রিলিজ হওয়ার মত তীব্র হিস্‌স্ শব্দে শূন্যে উঠে পড়ল কার্বন ফাইবার গ্র্যাপনেল, ঠং-ঠং শব্দে আছড়ে পড়ল ডেক প্লেটে। দড়ি টেনে রেলিঙে হুক

বাধিয়ে নিল দফার লীডার। অন্যজন সমানে গুলি ছুঁড়ছে আপারডেক সই করে।

আচমকা একটা ফ্লেয়ার ছুটে গেল ওপরে, নীলচে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।

রানার দু'পা পাথরের শেলফ স্পর্শ করল এই সময়, ফ্রেইটারের সুপারস্ট্রাকচারের ওপাশের দৃশ্য আড়াল হয়ে গেল। পায়ের নিচে শক্ত পাথরের ছোঁয়া পেতেই এক ঝট্‌কায় নিজেকে হার্নেসের বাঁধনমুক্ত করে ছুটল ও স্টার্লিং বাগিয়ে। অন্যরা এক সারিতে অনুসরণ করছে ওকে। এই সময় আফটার ডেকে উদয় হলো এক কমান্ডো, আলোয় দেখে ফেলল ওদের।

চিৎকার করে উঠল লোকটা, যতটা না সঙ্গীদের সতর্ক করার জন্যে, তারচেয়ে বেশি আতঙ্কে। পরক্ষণে অস্ত্র তুলে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল, রানার পায়ের কাছে কয়েক টুকরো চলটা উঠে গেল পাথরের। দৌড়ের ওপরই গুলি করল ও স্টার্লিঙের বাঁট কোমরের পাশে ঠেকিয়ে। একটা পাক্ খেয়ে দড়াম করে রেলিঙের ওপর আছড়ে পড়ল কমান্ডো, হাত থেকে অস্ত্র ছুটে পড়েছে ইনলেটে। এক ডিগবাজি খেয়ে সে-ও অনুসরণ করল ওটাকে।

শেলফের কিনারায় পৌঁছে লাফ দিল রানা, মুহূর্তে পড়ল এসে ডেকে। প্রায় একই সঙ্গে ডেকে পা রাখল লীডার দফার। মুহুর্মুহু গোলাগুলির আওয়াজে কাঁপতে শুরু করল ইনলেট, কারডাইটের নীলচে ধোঁয়ার মেঘে চারদিক ঢাকা পড়ে গেল। রানা থামল না, নিচের ভার আতাসীর ওপর ছেড়ে দিয়ে জামালকে সঙ্গে নিয়ে খাড়া স্টেয়ারওয়েলের দিকে ছুটে গেল। থেকে থেকে সংক্ষিপ্ত ব্রাশ ফায়ার করছে পথের সম্ভাব্য বাধা দূর করার জন্যে।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে রানাকে কাভার দিল জামাল শামলু। হুইলহাউসের কাছে পৌঁছে থামল ও, লম্বা করে দম নিল

কয়েকবার। পাশে তাকিয়ে যুবকের গ্রীজ মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। হেভি বুট পরা এক পা হ্যাচের গায়ে ঠেকাল সে, ওর চাপা 'নাউ!' শুনে ঠ্যালা দিল। হাঁ হয়ে গেল হ্যাচওয়ে।

ছোট এক প্যাসেজের ওপাশে হুইলহাউস, একজনই আছে ওখানে। থুত্নির কাছে রেডিও ট্রান্সিভার ধরে মহাব্যস্ত কণ্ঠে কথা বলছে আরেকদিকে ফিরে। কাঁধে ঝুলছে মিনি উজি। মানুষটা খাটো, তবে বেশ চওড়া। হঠাৎ বিপদ টের পেয়ে ঘুরল সে। নীল চোখে অবিশ্বাস ফুটল তার। চৌকো চোয়াল দৃঢ় হলো, কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র দেখল না ওরা লোকটার চেহারায়। বরং রেগে উঠতে দেখল। মুহূর্ত পর বিদেয় নিল রাগ, চওড়া দুই কাঁধ ঝুলে পড়ল। হার হয়েছে বুঝতে পেরেছে।

'মেজর, স্যার!' পিছন থেকে বলল জামাল শামলু। গলা কাঁপছে। 'কাজটা আমাকে করতে দিন।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে সরে দাঁড়াল ও। 'শিওর!'

দু'পা এগোল যুবক, লোকটার পেট সই করে গুলি করল। খসে পড়ল তার হাতের ট্রান্সিভার, বাংলার গৌরবের চকচকে ক্রোমিয়াম কন্ট্রোল প্যানেল রক্তে লাল হয়ে উঠল। আছড়ে পড়ে কয়েকবার মোচড় খেল দেহটা, তারপর হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল। তারের মাথায় দুলছে ট্রান্সিভার। একটা ক্যানকেনে গলা চিৎকার করছে ওটায়।

বাংলার গৌরব দখল সম্পন্ন হয়েছে।

রানার পার্সোনাল রেডিওতে আতাসীর রিপোর্ট ভেসে এল। শত্রুর সব পজিশন দখল করা হয়েছে, ছয় কমান্ডো নিহত, এদিকে অ্যাভনের দফার লীডার পায়ে গুলি খেয়েছে। আঘাত মারাত্মক নয়। সে আর দারভিশ সামান্য আহত, মাইনর ইনজুরি।

হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে বুক ভরে পাহাড়ী বাতাস টেনে নিল মাসুদ রানা। এবার রিক ক্লের খোঁজে যেতে হয়। বেঁচে আছে তো সে? নাকি...নিচে অচেনা কয়েকটা গলা শুনে নেমে এল। ক্রু'জ মেস থেকে বের করা হয়েছে ক্রুদের, ভয়ে তাদের কয়েকজনের অবস্থা খারাপ। আবোল-তাবোল বকছে। জটলার মধ্যে থেকে বিশালদেহী এক দাড়িওয়ালা এগিয়ে এল রানাকে দেখে।

'কারা আপনারা? ওমানী সোলজার?'

'আপনি কে?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'পাপাগাইকোস ইউমেন্ডিস। ক্যাপ্টেন।'

'নো মোর, নীল ডাউন!'

'হোয়াট!' চোখ কোঁচকাল গ্রীক।

'নীল ডাউন!'

'কেন, আমার কি দোষ? আমি...' দারভিশ পিছন থেকে লাথি মারল তার হাঁটুর ভাঁজে, হুড়মুড় করে পড়ে গেল লোকটা।

সেদিকে তাকাল না রানা, আতাসীর দিকে ফিরল। 'ফ্লেয়ার ছোঁড়ো! টোকিওকে সিগন্যাল দাও।'

'রাইট, বস্।'

'কাল রাতে যাকে বন্দী করা হয়েছে, তাকে কোথায় রেখেছে এরা?' বাকি ক্রুদের জিজ্ঞেস করল রানা।

'চেইন লকারে রাখা হয়েছে,' ফিলিপিনো কুক জবাব দিল।

একটা ফ্লেয়ার উড়ে গেল আকাশে। ঘুরে দাঁড়াল রানা। দশ মিনিট পর ক্লেকে নিয়ে ফিরল। বহাল তবিয়তেই ছিল সে, ইন্টারোগেশন শেষ পর্যন্ত করেনি কর্নেল ইয়োন্নি। মাদারশিপ প্রায় এসে পড়েছে, তাই খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি ব্যাপারটাকে।

ওদিকে ফ্লেয়ার ছোঁড়ার এক ঘণ্টা পর ইনলেটে ঢুকল গালফ পার্ল। মবি ও দুই জেট রেইডারকে বেঁধে নিয়ে এসেছে টোকিও।

আরেকদিকে যেনেক টীমের মাদারশিপ ইরগুন লিউমির কমিউনিকেশন অফিসার স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কর্নেল ইয়োন্নির হঠাৎ থেমে যাওয়া এবং তারপরই ব্রাশ ফায়ারের শব্দে যা বোঝার বুঝে গেছে সে।

বাইরে শেষ চেষ্টার প্রস্তুতি চলছে জোরেশোরে। স্ট্যান্ডবাই টীম ইনফ্লেটেব্ল্ জেমিনি নিয়ে পানিতে নামবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

বারো

অনেকদিন পর স্টার্ট নিয়েছে বাংলার গৌরব। মনের আনন্দে গান ধরেছে তার সতেরো হাজার হর্স পাওয়ারের বারমেস্টার অ্যান্ড ওয়েন ডিজেল এঞ্জিন।

প্রাণ ফিরে পাওয়ায় কাঁপছে ডেক প্লেট। অফিসার-ক্রুরা হৈ-হৈ করে অভিনন্দন জানাল তার প্রাণের স্পন্দনকে। ড্রেপস্ সরিয়ে ফেলা হয়েছে আগেই, এবার সমস্ত লাইন খুলে ফেলা হলো। নতুন ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা ধীরগতিতে ইনলেট থেকে বের করে আনল ওটাকে। ফার্স্ট মেট রফিক সাহায্য করছে ওকে। গালফ পার্ল গজ পঞ্চাশেক সামনে পাইলট করছে।

সবে ভোরের আলো ফুটেছে, এরমধ্যেই পরিবেশ গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে। পোর্ট সাইড ব্রিজ উইঙে দাঁড়িয়ে আছে দারভিশ ও জামাল। চেহারা হাসছে ওদের। আতাসী রানার পাশে

দাঁড়িয়ে ফিলিপিনো কুককে সকালের নাস্তা কি কি হবে তার ফিরিস্তি দিয়ে চলেছে।

এমন সময় হাসি শুকিয়ে গেল দারভিশের। অনেক দূরে কালোমত কি যেন দেখতে পেয়েছে ও মুহূর্তের জন্যে। দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে। চোখ কুঁচকে উঠল তার। না, আর দেখা যাচ্ছে না। ভুল দেখেছে কি না ভাবছে, তখনই আবার দেখা গেল। গুবরে পোকা সাইজের কি যেন–তিনটা। কয়েক সেকেন্ড বুঝে উঠতে পারল না ব্যাপারটা কি! ওগুলো কি জিনিস!

তারপর, একেবারে আচমকা বুঝে ফেলল সার্জেন্ট। কলজের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল তার। ওগুলো ইনফ্লেটেবল, জেমিনি–ঢেউয়ের মাথায় চড়লে পলকের জন্যে দেখা যায়, তারপরই নেই হয়ে যায় আবার। কারা ওরা?

ভাবল দারভিশ হামাম, কিন্তু সময় নষ্ট করল না এক মুহূর্তও। চেঁচিয়ে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবার।

'নেভার মাইন্ড!' বলে কুককে এক ধাক্কায় পথ থেকে সরিয়ে দিল আতাসী, দুই লাফে বেরিয়ে গেল। 'কোথায়?' দেখাতে হলো না, নিজেই দেখল সে। খুব বেশি হলে তিন মাইল দূরে আছে ওগুলো। ফার্স্ট মেটের হাতে হুইলের দায়িত্ব দিয়ে রানাও বেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে। পিছনে ওদের ব্যস্ত ছোটাছুটি দেখে ওদিকে টোকিওর সন্দেহ হলো কিছু, বোট অটো হেলমের হাতে ছেড়ে সে-ও বেরিয়ে এল ডেকে। তার চিৎকারে এক মুহূর্ত পরই রিক ক্লে উঠে এল ফো'ক্যাসল থেকে। দুই ডাইভার আহাম্মকের মত তাকিয়ে থাকল সামনে।

ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নাচতে নাচতে আসছে তিন জেমিনি, আধ মাইল পেরিয়ে এসেছে এরমধ্যে। কম করেও ত্রিশ নট গতিতে আসছে, রাবারের ভোঁতা বো বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে

আছে গতির তোড়ে। ওরা আর যে-ই হোক, বন্ধু যে নয়, তাতে কোন সন্দেহই রইল না রানার। ওদেরই মত কালো ড্রেস পরে আছে ব্যাটারা—বারোজন। তিনটেরই বো-র কাছে ট্রাইপডে বসানো আছে হেভি মেশিন গান।

ছুটে গিয়ে হুইলহাউস থেকে লাউড হেইলার নিয়ে এল ও। ওদের সবাইকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে বলে চ্যাঁচাতে লাগল খুদে স্যালভেজ বোটের উদ্দেশে, 'গালফ পার্ল, ক্লীপ ক্লীয়ার! গালফ পার্ল, ক্লীপ ক্লীয়ার!! আমরা সামাল দিচ্ছি ওদের, সরে পড়ো।'

এরমধ্যে দৌড়ে নেমে গেছে আতাসী, দারভিশ ও জামাল, দফার কমান্ডোদের নিয়ে পজিশনে বসে গেছে সাইডের নিরেট, পুরু লোহার শেলের আড়ালে। মাথা না তুললে গুলি লাগার কোন সম্ভাবনা নেই ওখানে। রানা ওপরে তৈরি হলো একটা জিপিএমজি নিয়ে, উত্তেজনায় ঘাম ছুটে গেছে ওর। অ্যামিউনিশন বেল্ট চেম্বারে ফীড করল, সেফটি ক্যাচ অফ করে তৈরি হলো।

বাঁ দিকের জেমিনি থেকে ছোঁড়া হলো প্রথম গুলি। তখনও যথেষ্ট দূরে ওটা, পুরো আওয়াজ কানে পৌঁছল না। গুলি পৌঁছল ঠিকই, তবে পোর্ট সাইডে পানিতে পড়ল সব। বড়জোর দুটো কি তিনটে লাগল ফ্রেইটারের হালে। আরেকটু এগিয়ে মাঝেরটা এক পশলা ছুঁড়ল, রানার কানের পাশ দিয়ে বোলতার গুঞ্জন তুলে ছুটে গেল কয়েকটা আধ ইঞ্চি তপ্ত মৃত্যু, ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে পড়ল ব্রিজের কাঁচ। রফিক বসে পড়ল ঝপ্ করে।

ওপরে থাকার পুরো অ্যাডভান্টেজ নিতে চাইল রানা, নিচের ওদের স্টার্লিঙের আওয়াজ ছাপিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে উঠল ওর জেনারেল পারপাস মেশিন গান। কিন্তু কাজ হলো না, ঠিক সময়মত অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে ডানে-বাঁয়ে সরে গিয়ে ফাঁকি দিল

ওগুলো। বেশ বড় বৃত্ত তৈরি করে দুটো জেমিনি চলে গেল ওপাশে, স্টার সাইডে। অন্যটা দূরে সরে গেল, ঘুরে পোর্ট সাইড দিয়ে এগোবার পাঁয়তারা করছে। গালফ পার্লকে পাত্তাই দিচ্ছে না।

আতাসীর উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল রানা, দু'তিনজনকে নিয়ে উল্টোদিকে গিয়ে পজিশন নিতে বলল। এবার একযোগে দু'দিক থেকে এল ওরা, নিজেরা পাইকারী গুলি খরচ করল বাংলার গৌরবের যন্ত্রতন্ত্র, তারপর ফের দূরে সরে গেল। এদিকে নিজেদের হালকা অস্ত্রের গুলি ওগুলোর কাছে পৌঁছাচ্ছে না বুঝতে পেরে প্রমাদ গুণল রানা। গুলির স্টক ফুরিয়ে আসবে ওদের যে কোন সময়, তখন কেমন হবে? আরও দু'বার একই কায়দা করে ওদের গুলি খরচ করাল ওরা। এভাবে ঠেকানো যাবে না ওদের।

উন্মাদের মত খেপাটে চোখে এদিক-ওদিক তাকাল রানা, কি দিয়ে ওদের ঠেকাবে বুঝে উঠতে পারছে না। এ মুহূর্তে একমাত্র ভরসা জিপিএমজি, কিন্তু গুলি বেশি নেই ওটার। তাড়াতাড়ি কিছু একটা করা না গেলে সর্বনাশ। নিচে আতাসী, দারভিশ ও অন্যরা সবাই বোকার মত ওদের চক্কর দেখছে। গালফ পার্ল ছুটছে ফ্রেইটারের আগে আগে। এর মধ্যে তিনগুণ ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে দুটোর মাঝখানে, প্রায় দেড়শো গজ দূরে রয়েছে এখন ওটা। পিছনে নাচতে নাচতে যাচ্ছে পিসি ও জেট রেইডার দুটো। ইনলেটে ওগুলো জায়গামত তুলে রাখার কথা ভাবলেও বিশেষ গরজ দেখায়নি কেউ, পরে করলে চলবে ভেবে রেখে দেয়া হয়েছে। নজর ঘোরাতে গিয়েও কি ভেবে ঝট্ করে ফের সেদিকে তাকাল ও। জেড রেইডার! ওগুলো হাতে পেলে হয়তো...ধড়মড় করে উঠে বসল, হেইলার মুখে ধরে চ্যাঁচাতে লাগল, 'গালফ পার্ল! গালফ পার্ল!! আমাদের পোর্ট সাইডে সরে যাও, জেট রেইডারের

টো লাইন খুলে দাও! গালফ পার্ল, আমাদের...!'

হাঁক শুনে আফট ডেকে এসে দাঁড়াল ক্লে ও টোকিও। ক্লের হাতে ম্যাগাফোন। 'বাংলার গৌরব! রিপিট করো, রিপিট করো!'

করল রানা। হতভম্ব হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল দুই ডাইভার। 'কেন? ওগুলো দিয়ে...'

'যা বলছি করো!' ধমক মেরে ক্লেকে থামিয়ে দিল ও। 'হারি আপ, সময় নেই।'

'ওকে!' অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

এদিকে রানার সঙ্গীরা নির্দেশটা বুঝল ঠিকই, কিন্তু তাৎপর্য বুঝল না। এ সময়ে ওগুলো কি কাজে আসবে ভেবে না পেয়ে মুখ তুলে ব্রিজের দিকে তাকাতে লাগল ঘন ঘন। তাদের নতুন নির্দেশ দিল ও, 'এখন কেউ গুলি ছুঁড়বেন না। জাস্ট ওয়াচ। আতাসী-দারভিশ, ওপরে রিপোর্ট করো।'

ওদিকে ফ্রেইটারের পোর্ট সাইডে সরে যেতে আরম্ভ করেছে গালফ পার্ল, অন্যদিকে তিন জেমিনি নতুন উদ্যমে তেড়ে আসতে শুরু করেছে। এবারও যথারীতি প্রচুর গুলি খরচ করে ফিরে গেল ওরা। পাল্টা হামলা হলো না দেখে মনে হলো বিস্মিত হয়েছে ব্যাটারা। অনেকেই ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

আতাসী আর দারভিশ পৌঁছল হুড়মুড় করে। দু'মিনিট ব্যস্ত গলায় কিছু বলে গেল রানা। সন্দেহ ছিল আতাসী ঘাবড়ে যেতে পারে ওর পরিকল্পনা শুনে। কিন্তু ঘটল উল্টো। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। 'নিশ্চয়ই, বস্। স্ট্যাব জ্যাকেট পরে নেব।'

'হ্যাঁ, এক্সট্রা ম্যাগাজিন নাও। আর এটার অবশিষ্ট বেল্টটা, হাতের জিপিএমজি দেখাল রানা। দুই মিনিট সময়।'

সার্জেন্ট ফিরে যাওয়ার জন্যে পা তুলল। চোখ স্যালভেজ বোটের দিকে। 'ছেড়ে দিয়েছে। আমি যাচ্ছি, স্যার।'

সামনে তাকাল মাসুদ রানা। টোকিও ছেড়ে দিয়েছে দুই ওয়াটার স্কুটার, ঢেউয়ের মাথায় উথাল পাতাল করতে করতে পিছিয়ে পড়ছে ওগুলো, ফ্রেইটার প্রতি মুহূর্তে সেদিকে এগোচ্ছে। ফার্স্ট মেটের দিকে ফিরে গতি কমানোর নির্দেশ দিল ও, সঙ্গে সঙ্গে গতি পড়ে এল ফ্রেইটারের। ব্রিজ উইঙে পেট ঠেকিয়ে নিচে তাকাল ও, স্থির চাউনি, বাংলার গৌরব আর দুই স্কুটারের ব্যবধান হিসেব করছে মনে মনে। বাঁদিকে, একশো গজমত সামনে রয়েছে ও দুটো, দড়ি ছেঁড়া কাণ্ডারীবিহীন ডিঙির মত এলোপাতাড়ি দুলছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবে ফ্রেইটারের জ্যাকব ল্যাডারের কাছে।

হাত নেড়ে রফিককে গতি আরও কমাতে বলল ও, জাহাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সঙ্কেত দিতে থাকল খুব হিসেব করে। কাজের ফাঁকে সঙ্গীদের নতুন নির্দেশ দিল রানা। লেফটেন্যান্ট ও সার্জেন্টকে কভার দিতে বলল দুই দফারকে, অন্যরা নজর রাখবে পোর্ট সাইডে। এবার ওরা এলে গুলি ছুঁড়তে হবে, যে ভাবে হোক ফ্রেইটার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

ওদিকে দূর থেকে পুরোটা ব্যাপার লক্ষ করছিল জেমিনিগুলো, বাঁধন খুলে দেয়া দুই স্কুটার ও জ্যাকব ল্যাডারে দুটো কাঠামোর ব্যস্ততা দেখে কিছু একটা সন্দেহ করে বসল, তেড়ে এল একযোগে। কিন্তু তেমন সুবিধে করতে পারল না। লাইট হলেও কয়েকটা মেশিনগানের টানা গুলিবৃষ্টির মুখে বাধ্য হলো পিছিয়ে যেতে। ওদের হেভি মেশিনগানের বিরামহীন গুলির আঘাতে পোর্ট সাইড হাল চালুনি হয়ে গেল।

জ্যাকব ল্যাডারের গোড়ায় নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে আতাসী ও দারভিশ। জানে, শত্রু যত গুলিই করুক, এত নিচে পৌঁছবে না একটাও। একাগ্রচিত্তে সামনে তাকিয়ে আছে সার্জেন্ট। আতাসী

কয়েক ধাপ ওপরে, হাতে স্টার্লিঙ প্রস্তুত। আচমকা কোন বিপদ দেখা দিলে মোকাবিলা করবে।

এগিয়ে আসছে জেট রেইডার। আর পঞ্চাশ গজ। আবার হামলা করল জেমিনি। বিপজ্জনক কাছে এসে পড়ল একটা, ব্রাশ ফায়ারের তোড়ে ওপরের সবাইকে মাথা নিচু করে শেল্টার নিতে বাধ্য করল। ওপর থেকে রানার জিপিএমজির তাড়া খেয়ে অবশ্য পালাল ওটা শেষ পর্যন্ত। কিন্তু রানা শঙ্কিত হয়ে উঠল, খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ব্যাপারটা। একদম খোলা জায়গায় আছে দারভিশ, আতাসী, হয়তো পরেরবারই মারাত্মক বিপদ ঘটে যাবে।

হঠাৎ জমে গেল ও। একটা জাহাজ! এদিকেই আসছে!

বোকার মত তাকিয়ে থাকল। কোত্থেকে এল? কিসের ওটা? কাদের? বাজে একটা শঙ্কা মনে উঁকি দিল, তাহলে কি ওটা এদের মাদারশিপ? এখনও মাইল কয়েক দূরে আছে যদিও, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না বেশ বড় জাহাজ ওটা।

নিচে ফ্রেইটারের কালো হাল একটু একটু করে দুই স্কুটারের দিকে এগোচ্ছে। হয়তো মন বিক্ষিপ্ত বলে সময়মত সঠিক সঙ্কেত দিতে ভুল হয়েছিল রানার, একটু বেশি ঘুরে গেল বাংলার গৌরব, দড়াম করে বাড়ি খেল একটা স্কুটার। ছিট্‌কে চলে গেল নাগালের বাইরে। মনে মনে হায় হায় করে উঠল দারভিশ, অন্যটা ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। ল্যাডারের রেইল ধরে যতদূর সম্ভব ঝুঁকে ডান হাত বাড়াল। এমন সময় কেঁপে উঠল ফ্রেইটার, পিছন দিকে ভয়াবহ বিস্ফোরণের আওয়াজ উঠল, একই সাথে স্টীল প্লেটিঙ ছেঁড়াখোঁড়ার বিকট শব্দ।

‘শেলিং করছে ওরা!’ চেঁচিয়ে বলল জামাল শামলু। ‘শোল্ডার-বোর্ন মর্টার, মেজর!’

প্রমাদ গুণল রানা। যা আশঙ্কা করছিল, ঠিক তাই করছে

ওরা। ফ্রেইটারের পিছনে শেলিং করছে, প্রপেলার বরবাদ করে দিতে চাইছে। যদি তা করতে পারে, তাহলে ওপরে উঠে আসা কয়েক মিনিটের ব্যাপার । ব্যস্ত হয়ে উঠল ও। ওদিকে ফ্রেইটার দুলে উঠতে বেসামাল হয়ে পড়েছিল দারভিশ, পড়েই যাচ্ছিল আরেকটু হলে, থাবা দিয়ে ধরল আতাসী। একই মুহূর্তে সে-ও চট করে ধরে ফেলল দ্বিতীয় স্কুটারের হ্যান্ডেলবার। দেখতে পেয়ে বাঁদরের মত কয়েক লাফে কম্প্যানিয়নওয়ে পেরিয়ে এল রানা, জিপিএমজি ঘাড়ে নিয়ে ছুটল জ্যাকব ল্যাডারের দিকে।

আধ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ফ্রেইটারের গা থেকে আলাদা হয়ে ছুটতে শুরু করল জেট রেইডার। রানা চালাচ্ছে, পিছনে বসে আছে আতাসী। ওর স্ট্যাব জ্যাকেট বাতাসে ঢোলের মত ফুলে আছে। ওদের আচমকা খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে দেখে অবাক হলো কমান্ডোরা। তাকিয়ে থাকল দূর থেকে। ওদিকে পুব আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য উঠতে শুরু করেছে।

একরাশ ফেনা তুলে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল জেট রেইডার, থেমে পড়ল। তখনই ফ্রেইটারের পিছন থেকে দু'নম্বর শেল ছোঁড়া হলো, দুলে উঠল বাংলার গৌরব। স্টার্নের প্লেটিং ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ওটা আরেকটু নিচে লাগলে···ভাবনার সময় নেই।

'রেডি?' কর্কশ গলায় বলল ও।

স্টার্লিঙের স্ট্র্যাপ ঘাড়ের আরেক পাশে বাধিয়ে জিপিএমজি নিয়ে তৈরি হলো বেদুইন। 'ইয়েস, বস্।'

দূরের জাহাজটার দিকে এক পলক তাকাল রানা। এখনও যথেষ্ট দূরে আছে। ওটার চিন্তা পরে করলেও হবে। ওদিকে তিন জেমিনি রানার মতলব কি বুঝতে না পেরে আলাদা হয়ে গেল পরস্পর থেকে। একটা তেড়ে এল, দেখতে দেখতে সর্বোচ্চ চল্লিশ নটে উঠে গেল ওটার গতি। নাক উঁচু করে ঝড়ের বেগে ছুটে

আসছে।

'চললাম,' বলল রানা. একচোটে অর্ধেকেরও বেশি ওপেন করে দিল থ্রটল। ঘোড়ার মত লাফ দিল জেট রেইডার, তেড়ে আসতে থাকা জেমিনির দিকে দৌড় শুরু করল। অন্য দুই জেমিনিও তৈরি হলো, যে কোন মুহূর্তে ছুটে আসবে। তুফান বেগে পরস্পরের দিকে ছুটছে প্রথম জেমিনি ও জেট রেইডার। জেট রেইডারের গতি জেমিনির তুলনায় বেশ কম, কিন্তু ওটার মত যখন-তখন তীক্ষ্ণ বাঁক নেয়ার বা বাউলি কাটার ক্ষমতা নেই জেমিনির।

সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাল মাসুদ রানা, ঘন ঘন এঁকেবেঁকে ছুটছে। দুশো গজ দূরে থাকতে গর্জে উঠল ওদের হেভি মেশিনগান। মাথার ওপর দিকে ঝাঁক ঝাঁক তপ্ত সীসা উড়ে গেল। দ্বিতীয় সুযোগটা তখনই চোখে পড়ল রানার, সেটা হলো ওদের বিরুদ্ধে শত্রুর হেভি মেশিনগান বেকার। এমনিতেই সারফেসে অনেক নিচু টার্গেট জেট রেইডার, ওদের মেশিনগান ট্রাইপডের ওপর বসানো বলে ঠিকমত অ্যাঙ্গেল পাচ্ছে না ব্যাটারা, তারওপর জেট রেইডার যত কাছে আসছে, ওদের গুলিও ততই ওপরমুখো হচ্ছে।

আতাসীর সুবিধের জন্যে ঝুঁকে, হ্যান্ডেলবারের ওপর প্রায় শুয়ে চালাচ্ছে রানা। চোখ কুঁচকে সামনে তাকিয়ে আছে অগ্রসরমান জেমিনির ফ্ল্যাট বোর দিকে, ঢেউয়ের মাথায় দড়াম দড়াম আছাড় খেতে খেতে ছুটে আসছে ওটা। বাকি দুই জেমিনি সঙ্গীদের কথা ভেবে গুলি করতে সাহস পাচ্ছে না, তফাতে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে।

এসে পড়েছে শত্রু, চারটে ফরসা, ঘামে ভেজা মুখ দেখতে পাচ্ছে রানা, প্রতি মুহূর্তে আরও কাছে চলে আসছে। হঠাৎ

চেহারাগুলো ঝাপসা হয়ে গেল পাশ কাটাবার সময়। পিছনে থেকে এক পশলা গুলি বৃষ্টি করল আতাসী. পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল জেমিনি। কম করেও সত্তর মাইল বেগে পরস্পরকে পাশ কাটাল নৌযান দুটো।

গতি কমিয়ে বাঁক নিল রানা, খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। ওদের টার্গেটের এঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। থেমে পড়ছে ওটা। দুই আহত সঙ্গীকে নিয়ে অন্যরা ব্যস্ত। সমস্যা টের পেয়ে অন্য দুটোর একটা এগিয়ে আসতে শুরু করেছে প্রথম জেমিনির সাহায্যে। বাকিটা দূরে, প্রায় অনড়।

'রেডি!' হুঙ্কার ছাড়ল রানা।

বুড়ো আঙুল তুলল আতাসী, পরমুহূর্তে পিছনদিকে জোর ঝাঁকি খেল স্কূটার লাফিয়ে উঠতে। দ্বিতীয় জেমিনির দিকে ছুটল রানা, প্রায় একই মুহূর্তে একসাথে গর্জে তিনটের তিন হেভি মেশিনগান। স্কূটার ঘুরিয়ে চট্ করে বড় দুই ঢেউয়ের মাঝখানের গর্তে সেঁধিয়ে গেল রানা। আড়ালে আড়ালে খানিকদূর এগোল, তারপর আরেক চকিত লাফে পরের গর্তে গিয়ে পড়ল। ওদের দেখে চেঁচিয়ে উঠল দ্বিতীয় জেমিনির এক কমান্ডো, কিন্তু গানার ট্রিগার টানার সুযোগ পাওয়ার আগেই হারিয়ে গেল স্কূটার।

দ্বিতীয় গর্তে পড়েই ওটাকে বিপরীতমুখী ঢেউয়ের দিকে ঘুরিয়ে দিল রানা। 'আতাসী, এইবার!'

পিছন থেকে এল ঢেউটা, তাই জেট রেইডারের পিছনদিক জাগল প্রথমে । সঙ্গে সঙ্গে ওর কানের পাশে হুঙ্কার ছেড়ে উঠল আতাসীর জিপিএমজি, দ্বিতীয় জেমিনির রাবারের দেহ আর কমান্ডোদের হাড় মাংস ছিঁড়ে খুঁড়ে বেরিয়ে গেল এক ঝাঁক তপ্ত মৃত্যুবান। আহতদের যন্ত্রণাকাতর চিৎকারে চাপা পড়ে গেল সব।

'বস্, জিপিএমজির গুলি শেষ!' ভয়ে ভয়ে তৃতীয় জেমিনির

দিকে তাকিয়ে বলল আতাসী। ওটা ফেলে স্টার্লিং তুলে নিল।

কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল রানা, ঘুরে দেখল তিন নম্বর জেমিনি ছুটে আসতে শুরু করেছে। ওটার হেভি মেশিনগানের গর্জনে আকাশ-বাতাস কাঁপছে। তবে সঙ্গীদের দুর্দশা দেখে সতর্ক হয়ে গেছে ওটার বোসান, কাছে আসছে না। বিপদ! কাছে না এলে স্টার্লিঙের পাল্লায় পাওয়া যাবে না ওটাকে, তারওপর আছে উল্টো গুলি খাওয়ার আশঙ্কা। দ্রুত উপায় ভাবতে লাগল রানা।

'বস্,' ডেকে উঠল বেদুইন। 'কিছুক্ষণ শেয়াল দৌড় দৌড়ালে ভাল হত মনে হয়।'

'মানে?'

'এলোপাতাড়ি দৌড়ঝাঁপ করার ফাঁকে সুযোগ বুঝে স্পীড কমিয়ে ওটাকে কাছে টেনে আনতে হবে। নইলে উপায় নেই আমাদের।'

বুদ্ধিটা মন্দ নয়, ভাবল রানা, তবে প্রচুর ঝুঁকি আছে। অবশ্য ঝুঁকি এখন এমনিতেও আছে, অমনিতেও আছে। অতএব আতাসীর পরামর্শ কাজে লাগিয়ে দেখবে ভাবল ও। দূরে হুঙ্কার ছাড়ল জেমিনির এঞ্জিন। না, রওনা হয়ে পড়েনি, হওয়ার আগে কেশে নিচ্ছে ভাল করে। কালো ধোঁয়া বের হলো পিছন থেকে। ওদিকে অজ্ঞাত জাহাজটা এসে পড়েছে, আর বড়জোর মাইলখানেক দূরে আছে। ফ্ল্যাগ নেই।

দেরিতে হলেও বুঝে ফেলল রানা ওটা কাদের। ইসরাইলীদের। কমান্ডোরা ওটায় চড়েই লম্বা পাড়ি দিয়েছে সাগরে। জেমিনিতে চড়ে দুনিয়া ঘুরে এতদূর আসা অসম্ভব। ওটা নিশ্চয়ই এদের মাদারশিপ বা কমান্ডশিপ।

এইচএমজির টানা হুঙ্কারে চিন্তাভাবনা তলিয়ে গেল, পানিতে বাঁকা এক লাইন ধরে বুলেট এগিয়ে আসছে দেখে থ্রটল ওপেন

করল রানা। বোলতার মত গুঞ্জন করে উঠল জেট রেইডারের পঁয়ত্রিশ হর্স পাওয়ারের সেলভা এঞ্জিন। এঁকেবেঁকে ছুটল। পিছনে লাইন ধরে এগিয়ে আসছে বুলেট, রেইডারের লেজের সাথে ব্যবধান কমে আসছে দ্রুত। এই অবস্থায় ওটার কাছে ঘেঁষার কথা চিন্তা করাও বোকামি।

কাজেই ছুটতেই থাকল ও। মরিয়া হয়ে উপায় খুঁজছে। বুঝতে পারছে বড়জোর আটাশ নট্ গতিতে ছুটছে ওরা, ওদিকে জেমিনি আসছে কম করেও পঁয়ত্রিশ নট্ গতিতে। প্রতি সেকেন্ডে ব্যবধান কমছে। ওটাকে স্টার্লিঙের বাগে পেতে হলে রানাকে গতি কমাতে হবে, কিন্তু তা অসম্ভব। বিপজ্জনকভাবে কাছিয়ে আসছে বুলেট, এ মুহূর্তে যত জোরে সম্ভব পালানোর চেষ্টাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

কি দেখে চোখ কুঁচকে উঠল রানার। সামনে এক জায়গায় পানিতে মৃদু আলোড়ন উঠছে, ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে পড়ছে। কিন্তু ওটা ঠিকমত চিনে ওঠার বা কিছু করার কথা ভাবার আগেই সময় পেরিয়ে গেল, বিদ্যুৎবেগে এসে পড়ল জিনিসটা। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে রানা বুঝল ওটা কি। কোরাল রীফ।

চেঁচিয়ে উঠল আতাসী। 'ইয়াল্লা! মেজর, সাবধান!' বলেই একহাতে ওর কোমর জাপটে ধরল।

'হোল্ড অন!' ওর সতর্কবাণী পুরো হওয়ার আগেই স্কূটারের নিচের স্কি শু দড়াম করে কিছু একটার সাথে বাড়ি খেল, হাতের মুঠোয় হ্যান্ডেলবার ভীষণ ঝাঁকি খেল, পরক্ষণে শূন্যে উঠে গেল জেট রেইডার। খানিকটা উড়ে গিয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল একরাশ পানি ছিটিয়ে। সৌভাগ্য যে উল্টে পড়েনি। বড় এক লূপ তৈরি করে দূরে সরে যাওয়ার ফাঁকে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল ওরা।

জেমিনির বোসানের চেহারা বিকৃত হয়ে উঠতে দেখা গেল.

বুঝতে পেরেছে সে বিপদটা কি ধরনের। হেলম ঘোরাবার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু পঁয়ত্রিশ নট্ গতিতে ছুটন্ত ইনফ্লেটেবেল গ্রাহ্য করল না। শেষ পর্যন্ত বো পোর্টের দিকে সামান্য ঘুরল বটে, তবে ওই পর্যন্তই, কোনাকুনি সড়াৎ করে সোজা রীফের ওপর চড়ে বসল জেমিনি। পুরু রাবার ছেঁড়ার আওয়াজ দূর থেকেও পরিষ্কার শুনতে পেল রানা-আতাসী। ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকির সাথে শূন্যে উঠে গেল বোসান আর চার কমান্ডো। বড়শির টান খেয়ে উঠে পড়া মাছের মত হাঁচড়পাঁচড় করতে করতে কোরালের অসংখ্য ধারাল দাঁতের ওপর আছড়ে পড়ল।

আগুন ধরে গেল জেমিনির পেট্রল ট্যাঙ্কে, দ্বিতীয় সূর্যের মত বিস্ফোরিত হলো ওটা। নিচে পড়েই বিস্ফোরণের ধাক্কায় ফের শূন্যে উঠে গেল একটা দেহ, ইংরেজি X-এর মত হাত-পা ছড়িয়ে কয়েকটা পাক খেয়ে আবার পড়ল। বোটের জ্বলন্ত অজস্র ছোট-বড় টুকরো পানিতে পড়ে জ্বলতে থাকল। উল্টেপাল্টে পড়ে থাকা দেহগুলোর কোনটায় প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল না।

'ওটা আমাদের ইন্টারসেপ্ট করতে আসছে,' নিচু গলায় বলল দারভিশ।

মাথা ঝাঁকাল চিন্তিত রানা। 'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু ওটা কি, মানে, কোন্ দেশী জাহাজ?' আবার চোখে বিনকিউলার লাগাল।

একেবারে ঝরঝরে চেহারার জাহাজ ওটা। কত যুগ পেইন্টের ছোঁয়া পায়নি বলা মুশকিল। এমন চেহারা, দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে না। তবে ওটার এঞ্জিন যে অস্বাভাবিক শক্তিশালী, চলা দেখলেই বোঝা যায়। এ মুহূর্তে অবশ্য গতি কম, আস্তে ধীরে এগোচ্ছে। বাংলার গৌরবের আধ মাইল দূরে আছে এখনও। ব্রিজ থেকে রেডিও অফিসার জয়ন্তর ডাক শোনা গেল

হঠাৎ। 'মেজর, ওটা ডাকছে আপনাকে।'

তাড়াতাড়ি এসে রেডিওর সামনে বসল রানা। তখনই কড়া হিব্রু অ্যাকসেন্টের ইংরেজিতে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'ইরগুন লিউমি কলিং বাংলার গৌরব। ডু ইউ রীড মি? ওভার।'

সন্দেহ সত্যি হওয়ায় আশ্বস্ত হলো ও। 'আই রীড ইউ, ইরগুন লিউমি।'

'জাহাজ থামান, প্লীজ। আমরা পাশে ভিড়তে চাই।'

'নেগেটিভ। আপনাদের মতলব যাই থাকুক, পূরণ হবে না। সময় থাকতে সরে পড়ুন।'

হেসে উঠল কলার। 'দান দান তিনদান বলে একটা কথা আছে, বাংলার গৌরব। দু'দান আপনি জিতেছেন, স্বীকার করছি। কিন্তু এই দানটা আমার। জাহাজ থামান!' হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠল তার গলা। 'সময় থাকতে গালফ পার্লে উঠে পড়ুন আপনারা, প্রাণ বাঁচান।'

'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কিন্তু গ্রহণ করতে পারছি না, দুঃখিত। কীপ ক্লীয়ার।'

'অল রাইট। আমি আপনাকে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে সাহায্য করছি। একটু অপেক্ষা করুন, প্লীজ।'

'আই কনফার্ম।' খোলা ব্রিজ উইং দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। কি করতে যাচ্ছে ব্যাটা? চিন্তায় কুঁচকে আছে কপাল। অন্যরাও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। একটুপর দ্বিতীয় ধারণাও সত্যি হলো ওর, দেখতে যা-ই হোক, কাজের বেলায় ওটা কোন সাধারণ শিপ নয়। স্টার-সাইড ব্রিজের বড়সড় জিনিসটার ওপর থেকে ত্রিপল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বেলজিয়ান বোফোর্স গান ওটা।

'সেরেছে!' নিচু গলায় বলল আতাসী। 'ওরা দেখছি...

'হ্যালো, বাংলার গৌরব!' বলে উঠল সেই কণ্ঠ। 'আমি কি

ধরে নেব আপনি এখনও আগের সিদ্ধান্তে অটল?'

'ঠিক ধরেছেন, সেইলর।'

'তাহলে এবার আরেকটু লক্ষ করুন।'

সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে বোফোর্স গানের প্রকাণ্ড ব্যারেল ঘুরতে শুরু করল বাংলার গৌরবের দিকে। সম্মোহিত চোখে দেখছে রানা, ফ্রেইটারের কার্গো হোল্ড বরাবর তাক্ করা হয়েছে ব্যারেল। আঁতকে উঠল ও মনে মনে। যদি বাই চান্স একটা গোলা হিট্ করে ওখানে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভেতরের গোলা বারুদ তো সব যাবেই, জাহাজটাও যাবে।

'এবার কি, বাংলার গৌরব?'

'আমার আঙুল মে-ডে বাটনে, ইরগুন লিউমি,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'আপনি নিশ্চই চান না ওমানী বা আমিরাত প্যাট্রল ছুটে আসুক। ওরা সমস্ত ট্রাফিক মনিটর করে জানেন হয়তো।'

'জানি,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল কলার। 'কিন্তু ওরা এলেও আপনার কোন লাভ হবে না, কারণ ততক্ষণে সী বেডে থাকবেন আপনারা ফ্রেইটারসহ।'

'আমি আকাশ প্যাট্রলের কথাও বোঝাতে চেয়েছি।' অসহায় পরিস্থিতি টের পেয়ে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। তীরে এসে তরী ডোবার আশঙ্কায় অস্থির। এখন আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

হেসে উঠল কলার। 'সে চিন্তা আগেই করে রেখেছি আমরা. বাংলার গৌরব। সে ক্ষেত্রেও শেষ পরিণতির কোন হেরফের হবে না। আমাদেরকেও যদি মরতে হয়, ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনার ফ্রেইটারকে যেতে দিচ্ছি না। বি শিওর অভ দ্যাট। আপনি কোন ট্রিক্ খাটাতে চাইলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেব।'

'এবার?' বলল আতাসী । চেহারা কালো হয়ে গেছে। 'এত

কিছু সব মাঠে মারা যাবে?'

জবাব না দিয়ে রেডিওর ওপর ঝুঁকল মাসুদ রানা। 'ঠিক আছে,. ইরগুন লিউমি। এক ঘণ্টা সময় দিতে হবে। নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করতে হবে আমাদের ।'

'কিসের আলোচনা? আলোচনার কি আছে?'

'আমার সাথে কয়েকজন প্যালেস্টাইনী অফিশিয়াল আছে, ইউ নো!' বিস্মিত আতাসীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসল রানা। 'এতদূর এসে সারেন্ডার করতে বাধ্য হওয়া ওদের জন্যে খুবই কষ্টকর, বুঝতেই পারছেন! ইমোশনাল হয়ে পড়েছে সবাই। একটু সান্ত্বনা দেয়া দরকার।'

ওর বোলচালে হাঁ হয়ে গেল প্রত্যেকে। চোখ কপালে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। 'এসব কি বলছ তুমি, বস্?' ফ্যাসফেঁসে গলায় আতাসী বলল 'সারেন্ডার করবে?'

'শাট্ আপ!' ধমক লাগাল ও রেডিওর সুইচ ইচ্ছে করে অন রেখে। 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না। সারেন্ডার না করে উপায় কি, দেখাও আমাকে। তোমাদের জন্যে আমি আমাদের জাহাজ হারাতে পারব না।'

'হ্যালো, বাংলার গৌরব! আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

'আমি ফ্রেইটারের স্টাফ। সেকেন্ড অফিসার।'

একটু বিরতি। 'আই সী! ঠিক আছে, সময় দেয়া হলো। তবে আধ ঘণ্টা। এর মধ্যে কাজ সারুন। ওদের বোঝান, সারেন্ডার করা ছাড়া সত্যিই কোন উপায় নেই।' খুট্ শব্দে অফ হয়ে গেল রেডিও।

'এটা কি করলে তুমি, মেজর?' হতাশ কণ্ঠে আতাসী বলল। 'তুমি শেষ পর্যন্ত...'

পাত্তা দিল না ও। 'সার্জেন্ট দারভিশ। কাম হিয়ার।'

রানার ডাকের মধ্যে জরুরী ভাব আছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সে। 'মেজর!'

বাহু ধরে তাকে এককোণে টেনে নিয়ে গেল ও। নিচু গলায় দ্রুত কিছু বলল। দু'চোখ জ্বলে উঠল তার, ঘন ঘন কয়েকবার মাথা দোলাল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল ব্রিজ ছেড়ে।

'কি হলো?' চোখ কুঁচকে তাকে দেখল আতাসী। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

সার্জেন্ট শুনতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না, বেরিয়ে গেল কিছু না বলে। রেগেমেগে তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল আতাসী, হাত ধরে টেনে থামাল রানা। 'যেতে দাও ওকে।'

'কোথায় যাচ্ছে লোকটা?' অনিশ্চিত দৃষ্টিতে রানাকে দেখল বেদুইন। চাউনিতে দ্বিধা, অবিশ্বাস।

'তুমি আজও দুম্বাই আছ, একথা আমি বিশ্বাস করি না, লেফটেন্যান্ট,' বলল রানা। 'দারভিশ জরুরী কাজে গেছে। চলে আসবে।' ঘড়ি দেখল, মহামূল্যবান পাঁচটা মিনিট পেরিয়ে গেছে এরইমধ্যে।

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, আটটা বিশে শেষ হয়ে যাবে ডেডলাইন।

জেরুজালেম। প্রধানমন্ত্রীর অফিস।

যেনেক প্ল্যানিং কমিটির সবাই বসে আছে নীরবে। কারও মুখে কথা নেই। চোখ লাল সবার, রাতে ঘুম হয়নি একজনেরও। সবচেয়ে করুণ অবস্থা যাহাল চীফ মেজর জেনারেল ইয়াদ এলিয়াহুদের। ইরগুন লিউমির কোডেড মেসেজ পাওয়ার পর থেকে মনের দুঃখে, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে তার। কর্নেল ইয়েহোনাথানের মত বিশ্বের সেরা কমান্ডো তার মিশনে ব্যর্থ

হয়েছে. মরে গেছে. এখনও মেনে নিতে পারছে না।

মোসাদ চীফ ইয়েহুদা বেন মেইর আজ বেশ ক্ষুব্ধ। এলিয়াহুদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই যে ডুবিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তার সংস্থার স্পাইরা অনেক পরিশ্রম করে এ ধরনের একেকটা টপ সিক্রেট খবর জোগাড় করে আনে, আর এইসব উচ্চাভিলাষী অকম্মার ধাড়ী অফিসাররা…

'ওগুলো তাহলে গেছে?' যাহাল চীফকে প্রশ্ন করল প্রধানমন্ত্রী। নির্বিকার গলা, একটু যেন অসন্তুষ্ট। 'ওরা সবাই মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার,' দূরাগত, অনিশ্চিত গলায় বলল মিকিমাউস। 'মারা গেছে।'

'আটজনই?'

'হ্যাঁ।'

'স্ট্যান্ডবাই টীম কি করছে?'

'ওরা ধরার চেষ্টা করছে বাংলার গৌরবকে,' একটু যেন উৎসাহিত দেখাল তাকে। 'ওরা বারোজন হয়তো একটা…'

'কিছুই করতে পারবে না ওরা,' বাধা দিয়ে বেন মেইর বলল বিরক্ত গলায়। 'আপনি জানেন, ইনলেট থেকে জাহাজ বের করে নিয়ে গেছে ওরা। খোলা সাগরে ওটাকে ফের আটক করা অসম্ভব একটা কাজ। আমিরাত বা ওমানী নেভির চোখে পড়ে গেলে উল্টে বারোটা বাজবে আমাদের।'

'কিন্তু ইরগুন লিউমি শেষ খবর পওয়া পর্যন্ত মুসানডেম পেনিনসুলাতেই ছিল, ওদের কারও চোখে পড়ার কোন খবর পাইনি।'

'খবর পেলে কি করবেন? যদি খারাপ খবর হয়?'

রাগে ভেতরে ভেতরে ফুলতে লাগল এলিয়াহুদ, তবু গলা যথাসম্ভব শান্ত রেখে বলল,' সব সময় নেগেটিভ চিন্তা করা ঠিক

নয়।'

'আপনি তো পজিটিভ চিন্তাই করেছিলেন, ফল কি হলো?'

'ফল হয়তো হত, যদি আপনার মেজর রোমান শেষ সময়ে পিছিয়ে না যেত।'

'তার জন্যেই আপনার মিশন বানচাল হয়েছে, তেমন কোন খবর কিন্তু এখনও আসেনি।'

প্রধানমন্ত্রী মুখ খুলল। 'অনর্থক তর্ক করে লাভ নেই। তারচেয়ে আসুন, আজ সাবাথ ডে। আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি স্ট্যান্ডবাই টীম যেন অন্তত সফল হয়।'

মাসিরাহ্। ওমানী এয়ারফোর্সের ৮ম স্কোয়ার্ড্রনের বেজ।

সকাল সোয়া আটটায় নিজের জাগুয়ার অ্যাটাক জেট নিয়ে আকাশে উঠল নাফিজ মুলতানী। দ্বীপের ওপর দুটো চক্কর দিয়ে আগের দিনের মত উত্তর-পশ্চিমে ছুটল বিদ্যুৎগতিতে। দেখতে দেখতে ওমানের উপকূল তার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাংলার গৌরব । সোয়া আটটা।

আর পাঁচ মিনিট বাকি ডেডলাইন পার হতে। ইরগুন লিউমির উল্টোদিকের জ্যাকব ল্যাডার বেয়ে পুরোদস্তুর ডাইভিং ইকুইপমেন্ট পরা সার্জেন্ট দারভিশকে উঠে আসতে দেখে সবার চোখ কপালে উঠল। কেউ সাগরে নামতে দেখেনি তাকে। মাস্ক আর পিঠের বোঝা খুলে সোজা ব্রিজে উঠে এল সে। মৃদু, স্বাভাবিক গলায় রানাকে বলল, 'কাজ শেষ , স্যার।'

'গুড!' তার পিঠ চাপড়ে দিল ও। ফার্স্ট মেটের দিকে তাকাল। 'রফিক! স্লো অ্যাহেড!'

'স্যার ?' বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল যুবক। অন্যরাও

অবাক হলো, পালা করে রানা-দারভিশ-রফিকের দিকে তাকাতে লাগল।

'স্লো অ্যাহেড, রফিক।'

আতাসী দু'পা এগোল। 'কি বলছ তুমি, বস্? ওরা গুলি ছুঁড়বে তো!'

'একটুপর এমনিতেই ছুঁড়বে। আগে থেকে তাই সরে যেতে চাই বোফোর্স কামানের সামনে থেকে।'

চেহারা আরও হতভম্ব হয়ে উঠল তার। 'মানে?'

'অপেক্ষা করো। এখনই বুঝতে পারবে।'

এতক্ষণ যা একটু দ্বিধা ছিল ফার্স্ট মেটের, রানার শেষ মন্তব্যে দূর হয়ে গেল। বিনাকলের চকচকে পিতলের হাতল ধরে টান দিল সে, এঞ্জিনরুমে ক্রিং-ক্রিং বেল বেজে উঠতে শোনা গেল। পানির আলোড়ন উঠতে শুরু করল স্টার্নে।

এমন সময় রেডিও খড়মড় করে উঠল। 'বাংলার গৌরব, কি হচ্ছে?'

'সময় শেষ হয়ে এসেছে,' জবাব দিল রানা। 'আপনাদের সাইডে ভিড়তে আসছি।'

ততক্ষণে স্টার্ন ঘুরতে শুরু করেছে ফ্রেইটারের। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটে গেল, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে ফেলল ইরগুন লিউমি। মহামূল্যবান সময়টুকু পুরো কাজে লাগাল রানা, বোফোর্সের ভীতিকর ব্যারেলের সামনে থেকে সরিয়ে আনল বাংলার গৌরবকে। বেশ খানিকটা সরে এসে থেমে পড়ল। এখন চেষ্টা করলেও এদিকে ব্যারেল ঘোরাতে পারবে না ইরগুন লিউমি।

'কি হলো, বাংলার গৌরব?' কলার বলল কড়া গলায়। 'থেমে পড়লেন কেন? হারি আপ্!'

মৃদু হাসির রেখা ফুটল রানার মুখে। দারভিশের দিকে

তাকাল। 'দুঃখিত, ভায়া! প্রপেলারে সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

একটু বিরতি। 'অল রাইট, আমরা আসছি।'

'আমি কিন্তু আমার প্রপেলারের সমস্যার কথা বলিনি, বলেছি আপনার প্রপেলারের কথা।'

'হোয়াট!' বিস্ফোরিত হলো কলার। 'মানে?'

'মানে আমার বন্ধুরা কিছুতেই জাহাজ সারেন্ডার করতে রাজি হলো না, তাই বাধ্য হয়ে...'

'চালাকির চেষ্টা করবেন না। তাহলে ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে।'

'না,' গম্ভীর হয়ে গেল ও। 'সেরকম কিছু করছি না। আমি শুধু আপনাদের এবং আপনাদের যারা এ কাজে পাঠিয়েছে, তাদের আক্কেলের গোড়ায় খানিকটা পানি ঢেলে বুদ্ধির উর্বরতা বাড়াবার চেষ্টা করছি।'

'কি বলতে চান আপনি?'

'আমাদের সাথে কয়েকজন প্যালেস্টাইনী অফিশিয়াল আছে বলেছিলাম না? তার মধ্যে একজন হচ্ছেন সার্জেন্ট নামটা গোপনই থাক, প্যালেস্টাইন সুইমার কমব্যাট ইউনিটের লোক। একটু আগে লম্বা ডুব সাঁতার দিয়ে ফিরেছেন তিনি, আপনারা দেখেননি।'

এইবার কেঁপে গেল...কলারের স্বর। 'বুঝলাম না, ডুব সাঁতার মানে কোত্থেকে ফিরেছে?'

'ইরগুন লিউমির স্টার্ন থেকে।'

ফ্রেইটারের হুইলহাউসের সব ক'টা মুখ ঘুরে গেল সার্জেন্টের দিকে। অবাক বিস্ময় সবার চাউনিতে, কিন্তু সে নির্বিকার। স্ফিংস বনে গেছে আবার।

'অ্যাঁ!' কলারের আঁতকে ওঠা টের পেল রানা পরিষ্কার।

'হ্যাঁ। কেন, জিজ্ঞেস করলেন না?'

'কেন?' শব্দটা আপনাআপনি বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

'আপনার স্লো মুভিং প্রপেলারে দড়ি প্যাঁচাতে। ছয়শো বিশ মিটার অ্যাবসেইল রোপ কয়েলের আস্ত একটা খরচ করে এসেছেন সার্জেন্ট। কাজেই এ অবস্থায় মুভ করার কথা ভাবাও উচিত হবে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ও। রেডিওতে কলারের চাপা গলার নির্দেশ শুনতে পেল, কাউকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে।

'দেখুন চেষ্টা করে ফাঁদ থেকে বের হতে পারেন কিনা। আমরা চলি, তাড়া আছে। সো লঙ, জেন্টলমেন! আর হ্যাঁ, আপনাদের ব্যবস্থা করতে ওমানী প্লেন আসছে। বাঁচতে হলে পানিতে ঝাঁপ দিন এখনই। আমাদের সাথে স্যালভিজ শিপ আছে, তুলে নেবে আপনাদের।'

তৃপ্তির সাথে ইরগুন লিউমির ডেকের হুড়োহুড়ি দেখল ও কিছুক্ষণ। সামনে-পিছনে সন্ত্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে মানুষগুলো, দিশে করে উঠতে পারছে না কি করবে, কোনদিকে পালাবে।

রফিকের দিকে ফিরল রানা। 'স্লো অ্যাহেড, মেট, লেফট রাডার।'

টেলিগ্রাফিক বেলের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই গুম গুম করে উঠল সতেরো হাজার হর্স পাওয়ারের বারমেস্টার অ্যান্ড ওয়েন। ধীরগতিতে এগোতে শুরু করল বাংলার গৌরব, সেই সাথে বাঁয়ে সরছে একটু একটু করে।

গালফ পার্লের সাথে যোগাযোগ করে তাকে দূরে সরে অপেক্ষা করতে বলল রানা। 'কেন?' প্রশ্ন করল রিক ওরফে চায়না ক্লে।

তেড়ে উঠল ও। 'ফের প্রশ্ন করে!'

হাসি শোনা গেল লোকটার, ঘুরতে শুরু করল গালফ পার্ল। ঠিক তখনই বিকট শব্দে মুখ তুলে তাকাল সবাই। মেটে আর বাদামী রঙের একটা ফাইটার, বেশ নিচু দিয়ে এদিকেই আসছে।

চারগুণ হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ইরগুন লিউমির ডেকে। কানে তালা লাগিয়ে বড় দুই জাহাজের মধ্যে দিয়ে ছুটে গেল ওটা চকিত এক ঝলকের মত। কাৎ হয়ে চক্কর শুরু করল, ঘুরে এখনই এসে হাজির হবে আবার।

বেজ যাতে শুনতে না পায়, সে জন্যে নিজের রেডিওর নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি খুব অল্প সময়ের জন্যে বদলে ক'দিন আগে রানার বেঁধে দেয়া ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করল নাফিজ মুলতানী। একটাই প্রশ্ন করল, 'শত্রু, রানা?'

এক শব্দে জবাব দিল ও। 'ইয়েস!'

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ফ্রিকোয়েন্সিতে ফিরে গেল পাইলট। বেজকে জানাল, সাগরে একটা সন্দেহজনক ডাউ দেখতে পেয়েছে। মনে হচ্ছে স্মাগলিং ডাউ। সে যা আশা করছিল, সেই নির্দেশই এল তৎক্ষণাৎ–ডুবিয়ে দাও। নিচু হলো নাফিজ মুলতানী, গতি বাড়িয়ে ছুট ছুট লাগাল ইরগুন লিউমিকে লক্ষ্য করে। সময়মত বাটন টিপে দিল।

দুটো ত্রিশ এমএম এডেন মিসাইল ছুটে গেল জাগুয়ারের ডানার নিচ থেকে, বিকট বিস্ফোরণের সাথে ওটার প্রায় পুরো সুপারস্ট্রাকচার টান মেরে ছিঁড়ে নিয়ে গেল, ছেঁড়া কাগজের মত উড়িয়ে দিল বাতাসে। কাৎ হয়ে উঠে যেতে শুরু করল এবার পাইলট। মামলা খতম।

বাংলার গৌরবের ব্রিজ উইঙে দাঁড়িয়ে সবাই দেখল সংক্ষিপ্ত, একতরফা হামলার ঘটনাটা। আতাসী, দারভিশ ও জামালের মুখে অনাবিল হাসি। চার দফারও হাসছে।

রানার কাছে সরে এল আতাসী। নিচু গলায় বলল, 'ভুল বুঝেছিলাম, বস্। মাফ করে দাও।'

তার কাঁধ চাপড়ে হাসল ও। ইরগুন লিউমির দিকে তাকাল।

স্থির হয়ে আছে ওটা, দাউ-দাউ করে জ্বলছে। তেলতেলে কালো ধোঁয়া ওপরে উঠে যাচ্ছে রূপকথার ড্রাগনের মত মোচড় খেয়ে, প্রকাণ্ড এক ছাতা তৈরি করেছে আকাশে। যেদিকে রকেট আঘাত করেছে, সেদিকে একটু একটু করে কাৎ হয়ে পড়ছে জাহাজটা।

ডুবে যাচ্ছে অপারেশন যেনেক কমান্ডো বাহিনীর মাদার শিপ ইরগুন লিউমি।

নতুন ক্যাপ্টেন মাসুদ রানার পরিচালনায় নিজওয়ার দিকে ছুটে চলছে বাংলার গৌরব। সংস্কৃতি মন্ত্রী, দফার উপজাতির নেতা, শেখ আজিজ বিন সাউদ বিন নাসির আল জাফরের নিজস্ব জায়গা ওটা। পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত জাহাজের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ওখানে থাকবে, কথা হয়েছে রানার সঙ্গে। বাংলার গৌরবে কোন অস্ত্র নেই, একথা প্রমাণ করার স্বার্থে কাজটা না করলেই নয়। নইলে নতুন সমস্যা বাধিয়ে বসতে পারে জেরুজালেম।

তারপর, ওদের গায়ের জ্বালা একটু কমলে, পরিস্থিতি শান্ত হলে, অন্য পথে জায়গা মত পৌঁছে যাবে ওসব। সে অন্য কাহিনী।

আমাদের বর্তমান কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

মরণযাত্রা

কাজী আনোয়ার হোসেন

বারোশো প্যাসেঞ্জার নিয়ে জেনেভা থেকে রওনা হলো ট্রেনটা, ঊনত্রিশ ঘণ্টার যাত্রা, গন্তব্য স্টকহোম। যাত্রীদের মধ্যে ইরাকী স্পাই ইব্রাহিম দানু আছে, এমথ্রীএক্স ভাইরাসে আক্রান্ত, যে ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক নেই।

ভাইরাসটা ট্রেনের বাইরে ছড়িয়ে পড়লে প্রথম দফায় এক বিলিয়ন মানুষ মারা যাবে, তারপর একে একে সব ক'টা মহাদেশের সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী সাফ হয়ে যাবে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। ওদের কপাল ভাল কি মন্দ, তা একমাত্র বিধাতাই বলতে পারবেন, যাত্রীদের মধ্যে মাসুদ রানাও আছে। শুরু হলো রক্তবমি, জ্বর; কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এল চোখ, মাংস থেকে আলগা হয়ে খুলে আসছে গায়ের চামড়া। সবাই আক্রান্ত। ট্রেন সীল করে দেয়া হয়েছে। পালাবার পথ নেই। এই পরিস্থিতিতে রানা যদি কিছু করতে না পারে, এমন কি নিজের মৃত্যুও যদি ঠেকাতে না পারে, ওকে কি দায়ী করা যায়?

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত নিজের কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন।

পাভেল,
পূর্ব রামপুরা, ঢাকা ১২১৯

এইমাত্র 'ধ্বংসের নকশা' শেষ করলাম। খুব ভাল লাগল। তবে বইটার প্রথম দিকে ছোট্ট একটা ভুল আছে। ভুলটা পৃষ্ঠা ১১তে। আরগুয়েলার জন্ম যদি '৬৮ সালে হয়, তবে সে '৭০ সালে বিমান ছিনতাই করে কিভাবে?

* তাই-তো! এতই ভয়ঙ্কর লোক যে ২ বছর বয়সেই আস্ত একটা প্লেন হাইজ্যাক করে বসেছে, এ অসম্ভব। খেলনা প্লেন হলে একটা কথা ছিল। ভুল স্বীকার না করে কোন উপায় নেই। ছাপা যখন হয়েই গেছে, কী আর করা−৭কে একটু কষ্ট করে নিজ হাতে ৯ করে নিন। আর, ভুল ধরিয়ে দেয়ার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

নিভৃতচারী,
ঢাকা।

১৯শে জুলাই, ১৯৯৯
কলম হাতে
বয়স হয়ে এল বুঝি তাঁরও, সে হোক
তবু তাঁর মানস পুরুষ−তিনি যুবা এখনও
এখনও অগ্নিপুরুষ−এখনও

সাহস-শক্তি এখনও দীপ্ত শাণিত বুদ্ধি
এখনও দৃঢ়প্রত্যয় দৃঢ়কল্প এখনও
আত্মবিশ্বাস তার সংক্রমণ তাতে
আক্রান্ত সংক্রান্ত আমরাও এবং
এ সাময়িক তবু ক্ষণিকের এই
ব্যাধি (উন্নাসিকেরা বলেন বলতেন!!!)
গোটা দেশ ছাওয়া অকাল
বৃদ্ধ যুবাদের ছানিপড়া সব চোখে
স্বপ্ন তারুণ্য জাগিয়ে দেয় যেন
কাঁটায় তুলে নেয় কাঁটা
মলাটে আঁটা ব্যাধি নাম রানা সে
সারায় জরাময় তথাগত যৌবন অধুনা
আমার তোমার এবং আরো'র

অতএব, সেই তিনি যার
অচরিতার্থ যিনি স্বয়ং মাসুদ রানা
তিনি জরা বার্ধক্য মুক্ত তিনি
চিরযুবা তিনি শতায়ু তিনি হোন
তিনি হবেন (সন্দেহ কী ...)
ক্ষণজন্মা তাঁর জন্মক্ষণের প্রতিদিনে
এই দেশের প্রত্যন্তে অন্তে অঞ্চলে তার
আনাচে কানাচে প্রতিখানে প্রতিকোণে
কত কত মাসুদ রানা জেগেছে
জাগছে জেগে আছে জেগে থাকে সে
হতে পারে বাইরে নয় তবু
মনের জন্মে প্রতিজন–তাই
একার্থে তিনি পিতা একার্থে অধিনেতা
আমার তোমার এবং আরো'র

সুতরাং সেই তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন
অভিবাদন জানাতে আজ এই দিনে
এই আমি স্বনিয়োজিত প্রতিনিধি যদি হই
এই বাংলার আর সব রানার হয়ে যদি
এই ক্ষুদ্র পরিসরের ক্ষুদ্র আয়োজনে বলি
শুভ জন্মদিন যদি বলে ফেলি
উই লাভ ইউ, ম্যান! তবে সে বলা
খুব কি অন্যায় হবে যদি হয়
তো কাজীদা! সে অন্যায় আমরা অবশ্যই

করতে পারি, কি পারি না?!!

* ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ।

অপু,

নবীপুর লেন, হাজারিবাগ, ঢাকা।

আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। যেমন, 'ঝড়ের পূর্বাভাস' বইটিতে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ঝড়ের যেরকম শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনা আপনি দিয়েছেন তা সত্য কিনা। বাংলাদেশে সত্যিই কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স আছে কিনা। 'আক্রান্ত দূতাবাসে' ৯১ সালে ইরাকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর মেজর অপারেশনের কথা বলা হয়েছে–এটা কি সত্যিই? মাসুদ রানার কোনও বইয়ে দেখিনি 'এ বইয়ের ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক'–আমি কি তাহলে ধরে নেব যে এবইয়ের নাম ভিন্ন আর সবকিছু বাস্তব?

অন্য একটি প্রসঙ্গে জানতে চাইছি। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল নিয়ে শুধু গল্পই শুনতে পাই: আমার প্রিয় সেবা কি বারমুডা নিয়ে কোন বই প্রকাশ করেছে?

আর একটি প্রশ্ন : ইফতেখার আমিন কর্তৃক লিখিত মেজর রাহাতই কি মাসুদ রানা সিরিজের মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খান?

শেষ প্রশ্ন : আমি কি মাসুদ রানাকে আমার জীবনের আদর্শ হিসেবে নিতে পারি?

* আপনার অসংখ্য প্রশ্ন থেকে বাছাই করার পরও এতগুলো প্রশ্ন বের হলো। সাধ্যমত জবাব দেয়ার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এরকম ঝড় হয়।...নিশ্চয়ই আছে, তবে নাম হয়তো ভিন্ন।...আক্রান্ত দূতাবাসে যে মেজর অপারেশনের কথা বলা হয়েছে, তারই নাম গাল্‌ফ্ ওয়ার।...যে-বইয়ের কাহিনীকে নিজের গায়ে টেনে নিয়ে কারও পক্ষে আইনের আশ্রয় নেয়ার সম্ভাবনা থাকে, বিশেষ করে সেসব বইয়েই আত্মরক্ষার জন্যে ওই ঘোষণা দেয়া হয়।...সেবা থেকে 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গল' নামে একটি বই তো আছে।...হ্যাঁ।...মাসুদ রানা দোষে-গুণে একজন জীবন্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি। দোষগুলো বাদ দিয়ে ওর গুণগুলোকে আদর্শ হিসেবে নেয়ায় আমি তো কোনও ক্ষতি দেখি না।

তানিম ও ইফতেখার,

ঢাকা।

আমরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র। বলতে গেলে আপনার প্রকাশনীর বইগুলোই আমাদের বাংলা সাহিত্যের সাথে একমাত্র যোগাযোগ। আমরা আপনার লেখা মাসুদ রানা সিরিজের অন্ধ ভক্ত এবং দুজনে মিলে প্রায় আড়াইশো বই কিনেছি। কাজীদা, কথাটা কিভাবে বলব জানি না, কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি মাসুদ রানা আর সেই আগের মাসুদ রানা নেই। মাসুদ রানার কাছের লোকজন, অফিসের আড্ডা, রাহাত খান, গিলটি মিয়া এবং সোহানার গত বিশ বা আরও বেশি বই ধরে কোনও পাত্তা নেই। কাজীদা, আপনার বই

আমরা সাড়ে চার বছর ধরে পড়ছি। আপনার লেখার স্টাইল আমরা ভাল করেই চিনি। ইংরেজি বই অবলম্বন করে লিখলেও আপনি ওগুলোতে আলাদা এক ধরনের ফ্লেভার যোগ করেন যা কিনা নেশার মত। এখনকার বইগুলো যেন ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের অনুবাদ। আমরা জানি বর্তমান বইগুলো আপনি লিখছেন না। প্লিজ, কাজীদা, আবার লিখতে শুরু করুন, হারিয়ে যেতে দেবেন না আমাদের রানাকে।

* তোমরা আমাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছ জেনে আমরা সত্যিই আনন্দিত। তোমাদের অনুযোগ সম্পর্কে অবহিত হলাম, কিভাবে অনুবাদগন্ধী মাসুদ রানার হাত থেকে বাঁচা ও তোমাদের বাঁচানো যায় সেটা আমরা গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখব। তোমাদের সুন্দর গঠনমূলক আলোচনার জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাবু,
বিডিআর ক্যাম্প, পিলখানা, ঢাকা ১২০৫

শুরুতেই আপনাকে এবং সেবার সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা। আমি আপনার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মাসুদ রানার একজন অন্ধ ভক্ত। রানার সবগুলো বই আমি পড়েছি। এটা আমার গর্ব। কখনও আলোচনা বিভাগে লিখিনি। কিন্তু এইমাত্র শেষ করলাম সিরিজের ২৮১নং বই 'আক্রান্ত দূতাবাস'। এক কথায় অসাধারণ। ভবিষ্যতে এই রকম প্রচণ্ড অ্যাকশনের বই আরও চাই। জর্জ ভালদেজের মৃত্যু মেনে নিতে কষ্ট হয়েছে। প্রার্থনা করি, জর্জ এবং রানার মত দেশপ্রেমিক এদেশেও জন্মগ্রহণ করুক। কেন না দেশের বর্তমান অবস্থায় এদের খুবই প্রয়োজন।

জানি না এ-চিঠি ছাপা হবে কিনা, তবে একটা অভিযোগ–'আক্রান্ত দূতাবাসে'র ১৪০পৃষ্ঠায় লেখা, মিশনের নাম ব্ল্যাক ব্যাট। কিন্তু শেষে হয়ে গেল ব্ল্যাক ক্যাট। বাদুড় ও বিড়াল কি এক?

* ছি, ছি, ছি! বিশ্রী একটা ভুল! বর্ণনায় বাদুড়ই বলা হচ্ছে, কিন্তু যখনই ওয়্যারলেসে কথা বলছে, তখনই হয়ে যাচ্ছে ব্ল্যাক ক্যাট। এই মারাত্মক ভুলটা ধরিয়ে দেয়ায় আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আজই আমরা ভুলটা আমাদের কম্পিউটারে সংশোধন করে রাখব, যাতে ভবিষ্যৎ রিপ্রিন্টে শুদ্ধ ছাপা হয়। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।

মোঃ মোখলেসুর রহমান,
হরিনাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ।

আমি সেবার একজন পুরাতন পাঠক, সেবার বহু বই পড়েছি। ভাল/খারাপ দুটোই অনুভব করেছি। ভাল লাগা কয়েকটি বইয়ের নাম বলছি। রানা সিরিজের 'বিস্মরণ', 'বিদায় রানা' 'হ্যালো, সোহানা', 'আই লাভ ইউ, ম্যান' 'সঙ্কেত', 'অগ্নিপুরুষ' ইত্যাদি।

সেবার পুরাতন অনেক ভাল বই আবার ছাপার ব্যবস্থা নিচ্ছেন জেনে

আপনাদের সবাইকে আমার হৃদয় উজাড় করা প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

* আমাদেরও শুভেচ্ছা জানবেন।

বাবুল আহমেদ,
কলেজ রোড, রংপুর।

শ্রদ্ধা জানবেন। 'আত্মনির্মাণ' হাতে এসেছে। এত শীঘ্রই আমার পরামর্শের বাস্তব রূপ দেখতে পাব আশা করিনি। বইটা হাতে নিয়ে বেশ আনন্দ বোধ করলাম। ভাবতে ভাল লাগল যে এই বইটি প্রকাশের পিছনে অতি সামান্য হলেও আমার ভূমিকা রয়েছে। একটু যেন গর্বিতও বোধ করলাম বাড়াবাড়ি, তাই না?

আপনাকে ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, চমৎকার প্রচ্ছদের জন্য আলীম আজিজ ভাইকেও ধন্যবাদ। বইটিতে কিছু চিঠি ছাপার কথা আপনি বলেছিলেন, কিন্তু কই, কোনও চিঠি তো ছাপা হয়নি?

রানা ধরেছি উচ্চ মাধ্যমিকে ওঠার পর। সিরিজের প্রথম দিকের কোনও বইয়ের আলোচনা বিভাগে জনৈক পাঠকের চিঠির উত্তর থেকে জেনেছিলাম, রানা সিরিজে অশ্লীলতার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সেবাকে শেষ পর্যন্ত আদালতে যেতে হয়েছিল; কিন্তু তারপর প্রসঙ্গটি কিভাবে সমাপ্ত হয়েছিল তা আর জানতে পারিনি। কৌতূহলটা রয়ে গেছে, জানাবেন কি? আর একটি প্রশ্ন: আলোচনা বিভাগে "নিজের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা লিখতে ভুল করবেন না" এই কথাটি কেন লেখা হয়?

* নাম-ঠিকানা ছাড়া ভৌতিক চিঠির দায়-দায়িত্ব কারও ওপর বর্তায় না, তাই। বিষয়বস্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় হলেও এসব চিঠি ছাপা যায় না। তাছাড়া, প্রায়ই পত্রলেখকের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ে কোনও ব্যবসায়িক প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে। ...হ্যাঁ, মাসুদ রানা সিরিজের 'স্বর্ণমৃগ' বইটি তৎকালীন সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছিল, সেবা আপীল করে সে ঘোষণা বাতিল করিয়েছিল। তবে এর পিছনের ব্যক্তিটিকে মানহানির মামলা করেও শায়েস্তা করা যায়নি। এখনও সে নিজেকে শিল্প-সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও অভিভাবক ধরে নিয়ে ময়ূরের মত পেখম মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'হাজার প্রশ্নের উত্তর' নাম দিয়ে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করবেন বলে মহাজাতক 'আত্মনির্মাণ' বইটিতে চিঠির উত্তর দিলেন না। ...আপনি অযথা গর্ব বোধ করেছেন একথা বলা যাবে না। কারণ, আপনার চিঠিটি আমি মহাজাতককে পড়তে দিয়েছিলাম। আইডিয়াটি আমাদের দুজনের পছন্দ হওয়াতেই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। আপনার অবদান তো নিশ্চয়ই আছে এতে।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২২-৯-৯৯ দ্য পার্ল (প্রজা/ক্লাসিক) কাজী শাহনূর হোসেন
বিষয়: দরিদ্র মুক্তো-ডুবুরি কিনো। পয়সার অভাবে একমাত্র সন্তানের চিকিৎসা করাতে পারছে না। হঠাৎ করেই মহা মূল্যবান এক মুক্তো পেয়ে গেল ও। মুক্তো পেয়ে নানা রঙীন স্বপ্নে বিভোর। ভাবছে সবাই বুঝি ওর মতই আনন্দিত। কিন্তু আসলেই কি তাই?

২২-৯-৯৯ রাতের মত একা (প্রজা/উপন্যাস) খন্দকার মজহারুল করিম
বিষয়: ট্রেনের কামরায় পরিচয়, কিন্তু মাশুকের মনে হলো আইরিনের অপেক্ষায় অতীত দিনগুলো কাটিয়েছে ও। আর আইরিনের মনে হয়েছে সে এতকাল যাকে খুঁজে বেড়িয়েছে সে মাশুক। কিন্তু মাশুক তো বিবাহিত। কি হবে শেষ পর্যন্ত?

২২-৯-৯৯ স্বপ্নের অপরাহ্ন (প্রজা/উপন্যাস) শাহরিয়ার শামস
বিষয়: মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে রূপা। ভালবেসেছে এক বেকার ছেলেকে, টিউশনির টাকায় যার পেট চালানোই দায়। ধার-দেনা করে কোনমতে টিকে আছে। বাবা রূপার বিয়ে ঠিক করেছেন এক ডাক্তারের সঙ্গে। চাকরি-বাকরি না পেয়ে হাল ছেড়ে দিল হাসান। সবকিছু ছেড়ে ঢাকা ত্যাগ করবে সে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কে যেন দেখাল পথের দিশা!

আরও আসছে

২৬-৯-৯৯ রহস্যপত্রিকা (১৫ বর্ষ, ১২ সংখ্যা) অক্টোবর '৯৯